# পাপড়ি রহস্য

গৌতম রায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স / ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা-৭০০০৭৩

শ্রীসমীরকুমার নাথ

অনুজ প্রতিমেষু

নীলের যে হঠাৎ কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। ইদানীং কেমন যেন ও বোবা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর হুঁ-হ্যাঁ উত্তর দিয়ে চুপ করে যায়। বেশীর ভাগ সময় একা একা বসে থাকে। আর, কারণে অকারণে একটা আপাতঃ অর্থহীন ছড়া আউড়ে যায়। ছড়াটার মাথামুণ্ডু কিছুই আমার বোধগম্য হয় না।

কনকনে শীতের সন্ধ্যা। কিছুক্ষণ আগেই বাগানের পশ্চিম দিকে ঝাঁকড়া-মাথা নিমগাছটার ফাঁক দিয়ে সূর্যটা বিদায় নিয়ে গেছে। শীতকালে কখন যে টুপ করে সন্ধ্যে নেমে এসে দিনের আলোটা নিভিয়ে দেয় বোঝাই যায় না।

নীলের ছোট্ট ঝুলবারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ওর সগু কেনা মডার্ন ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশানের ইনটারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম।

নীল আমার সামনের চেয়ারটায় ওর গাঢ় সবুজ রঙের শালটা লম্বালম্বি বুক থেকে পা পর্যন্ত চাপা দিয়ে একের পর এক ফিল্টার উইলস্ শেষ করে চলেছে আর মাঝে মাঝে সেই ছড়াটা আওড়াচ্ছে—'ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।'

এই নিয়ে বার দশেক ও ছড়াটা আওড়াল। কেবল আজ না, দিন সাতেক হল ঐ ছড়াটা ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই। এক-দিন ত আমার সামনেই ওদের সাইকেল হাউসের একজন খদ্দেরকে ছড়াটা বলে বসল। লোকটা বোধ হয় কোন গ্রাম্য ক্রেতা। বেচারী একটা সাইকেল পছন্দ করে দামটা একটু কমাতে বলেছিল। তা সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীল হুম করে বলে উঠল—'ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।'

লোকটা হাঁ করে খানিকক্ষণ নীলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—পাগল নাকি ?

তারও উত্তরে নীল বলেছিল—ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।

শেষ পর্যন্ত লোকটা রেগে গিয়ে 'ছ্যাঁচড়া লোক' এবং 'ভদ্রত শেখে নি' বলে চলে গিয়েছিল। নীল কিন্তু নির্বিকার।

অনেকবার আমিও চেষ্টা করেছিলাম ওর কাছ থেকে ছড়াটার মানে জানতে। কিন্তু আমারও সেই লোকটার মত—ছ্যাঁচড়া এবং ভদ্রতা শেখে নি বলতে ইচ্ছে করেছে বার বার। নীল তথৈবচ।

আজ বিকেল থেকে বেশ ঘন ঘন ছড়াটা আওড়াচ্ছে।

'নাঃ, বিরক্তিকর' বলে আমি বইটা বন্ধ করে উঠে পড়লাম। বরং এর থেকে রান্নাঘরে গিয়ে তপার মার কাছ থেকে শুক্তোয় কি কি মশলা লাগে অথবা আলুবখরার চাটনিতে কতটা গুড় দিতে হয়, এসব শিখে রাখলে পরে প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

নীলকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছি। হঠাৎ ও আমার চাদর খুঁটটা চেপে ধরল—

—বোস, বোস। রাগ করে যাচ্ছিস কোথায় ?

—তপার মার কাছে—রান্না শিখতে।

—ওটা তোর দ্বারা হবে না। বরং বোস। একটু গল্প করি।

—সেকি গোয়েন্দাপ্রবর! গল্প করার মত মন আর মেজাজ এখনও আপনার আছে নাকি ?

—আছে, আছে। নিশ্চয় আছে। কিন্তু কি জানিস বড় অবহেলায় সময়টা বয়ে যাচ্ছে। কিছুই করা হচ্ছে না।

—তাই বুঝি আবোল-তাবোল বকছিস ?

—কি করব বল। কাজ না থাকলে খই ভেজে সময় কাটানো।

—সময় কাটানোর তোর অভাবটা কোথায় শুনি ? অমন একটা শাঁসালো ব্যবসা দেখে আর সময় থাকে কারো হাতে ?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে নীল বলল—একদম ভাল্লাগে না। কেবল দোকানদারি করতে করে বল্ ত ?

টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম—কিন্তু কি করতে চাই ত বলবি ?

একটুও দ্বিধা না করে নীল বলে উঠল—কেবল খেতে। নেমন্তন্ন বিয়ে-বাড়িতে পাত পেড়ে।

আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। নেমন্তন্ন খেতে নীল! আশ্চর্য! আমি যতদূর ওকে জানি, পারতপক্ষে ও কোন কাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যায় না। বরাবরই একটা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সেই নীল বলে কিনা নেমন্তন্ন খেতে ইচ্ছে করছে! খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তোর কি আজকাল মাথার ব্যামো-ট্যামো ধরেছে ?

সজোরে মাথা নেড়ে নীল বলল—না, একদম না। ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি তাকে ফেলব আমি গিলে। আসলে কি জানিস চিরকেলে ভেতো বাঙালির ছেলে। বিয়ে-বাড়ির ফুলকো লুচি আর সেন্টের পাঁচমিশেলী একটা গন্ধ না পেলে মনে হয় বাঙালির ছেলের জাত গিয়েছে। আচ্ছা অজু, তোর একদম ইচ্ছে করে না মাটিতে বসে কলাপাতা সাজিয়ে লুচি বেগুন-ভাজা থেকে দই মিষ্টি দিয়ে এক একদিন রাতের খাওয়া সারতে ?

—আমার নিশ্চয় করে। কিন্তু এসব ব্যাপার ত তোর কোনদিনও ছিল না।

—ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন মনে হল, অনেকদিন আমাকে কেউ নেমন্তন্ন করে নি। তবে কি কলকাতা শহরে আমাকে নেমন্তন্ন করার মত কোন বন্ধুবান্ধব নেই ? এই কমপ্লেক্সটা যেদিন থেকে গ্রো করল, সেদিন থেকেই কেমন যেন ভেতরে ভেতরে একটা নেমন্তন্ন খাই ভাব এসে গেছে।

—আর তাই ব্যাং বাদুড় যা পাবি তাই খাবি ?

—খাব। আলবত খাব। চাঁদের পাহাড়ে মনে নেই? তেষ্টায় ছটফট করতে করতে শঙ্কর ত্রিশ বছরের পুরনো পোকা-কিলবিলে কালো জলই ঢকঢক করে খেয়ে নিল। তার ওপর—এটা কি মাস বল ত ?

—মাঘ।

—চোখ বন্ধ করে নাক খুলে যে কোন রাস্তায় হেঁটে যা কেবল লুচি ভাজার গন্ধ ছাড়া আর কিছু পাবি না।

—এক কাজ কর। এবার তুই একটা বিয়ে কর।

—তোর মাথায় গোবর পোরা। নিজের বিয়েতে কেউ পাত পেড়ে লুচি বেগুন-ভাজা খেতে পারে ?

—বেশ ত, তোর অনারে না হয় আমিই বিয়েটা সেরে ফেলছি। সোমেন জেঠু ত পা বাড়িয়েই আছেন।

—না রে, সে হয় না। তোর বিয়েতে আমাকে খেটে খেটে হয়রান হতে হবে। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?

—কি ?

—অজন্তা বা রেখার একটা বিয়ে লাগিয়ে দিলে কেমন হয় ?

আমি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝনঝনিয়ে। 'নেমন্তন্ন' বলেই নীল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফোন ধরল।

বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত কে যেন বরফ ঘষছে। আসলে ওৎ-পাতা বাঘের মত শীতটা শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আচমকা। কুয়াশার চাদরে মোড়া বাইরের অন্ধকারটাও বেশ গভীর মনে হচ্ছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। প্রায় সওয়া সাতটা! বাইরেটা দেখে কে বলবে রাত এত কম ? চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলাম। নীল তখনও ফোনে কথা বলে চলেছে। এরই ফাঁকে

আমি নিচে গিয়ে তপার মাকে তু'কাপ কফির কথা বলে এলাম।

ফিরে এসে দেখি নীল ওর ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে জামা-প্যাণ্ট বার করছে। সামনের সোফাটায় আমি বসতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নীল বলে উঠল—না রে, আর বসবার সময় নেই। এক্ষুণি বেরুতে হবে।

—এই ঠাণ্ডার মধ্যে আবার বেরুবি কোথায়? কে ফোন করেছিল?

—সিম্পল লায়ন। তুই বোস। আমি রেডি হয়ে আসছি।

—কিন্তু কি ব্যাপার?

—নেমন্তন্ন। বিয়ে-বাড়িতে।

—তার মানে?

—ঐ যে ব্যাং বাতুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে! কেউ বোধ হয় ব্যাং বাতুড় কিছু ছড়িয়েছে। আর সেটা আমাকেই গিলতে হবে। ডাক দিয়েছেন সিম্পল লায়ন।

—হেঁয়ালী রেখে কি হয়েছে বলবি ত?

—বলব। যেতে যেতে।

নীল চলে গেল। জামাকাপড় পালটাতে। এই এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। কোন কথাই আজকাল সহজ আর সরল করে বলতে পারে না। সব কিছুতেই একটা হেঁয়ালি পুযে রাখা। ডাক দিয়েছেন সিম্পল লায়ন। সিম্পল লায়ন অর্থাৎ সরল সিংহ। ইন-স্পেক্টর সরল সিংহ। তার মানে পুলিসী ব্যাপার। নিশ্চয় খুনখারাপি! এই সরল সিংহের ওপর আমার মাঝে মাঝে বেশ রাগ জমে ওঠে। নিজে যে কেসটা জটিল মনে করেন, সঙ্গে সঙ্গে ডাক দেন নীলকে। সিংহীমশাই ভালো করেই জানেন, নীল মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও রহস্য ওর ভালো লাগে। যে কোন কেসের জটিল জট ছাড়িয়ে আসল ক্রিমিন্যালটিকে খুঁজে বার করতে ওর দারুণ ইণ্টারেস্ট। আর এই দেখতে-বোকা অথচ চতুর সিংহীমশাই ঠিক ঠিক সময়ে

নীলকে এত্তেলা পাঠান।

সিম্পল লায়ন নামটা নীলের দেওয়া। সিংহীমশাই-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল নীলের জামাইবাবু পুলিস অফিসার সত্যেন মুখার্জীর বাড়িতে। গতবার অজয় সামন্তর হত্যারহস্য ভেদ করার পর সত্যেনদার বাড়িতে বসে নীল ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল কেমন করে ও কেসটা সলভ্ করেছে। এমন সময় সিংহীমশাইয়ের রাজকীয় আবির্ভাব ঘটে।

এসেই হম্বিতম্বির হাঁকডাক শুরু করে দিলেন—দাদা, এসে পড়লুম। বৌদি একটু চা হয়ে যাক।

বয়েসে বোধ হয় সত্যেনদাই ছোট হবেন। কিন্তু পদমর্যাদার জন্যে সিংহীমশাই সত্যেনদাকে দাদা বলে ডাকেন, তা আমার বুঝতে অসুবিধা হল না। খানিকটা তেলটেল দেওয়া আর কি।

বিশাল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশেই সোফাটার তিন ভাগ জায়গা দখল করে বসলেন। আমি একটু সরে ওঁকে ভালো করে বসার জায়গা করে দিলাম।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে 'আঃ' বলে রুমাল দিয়ে টাকটা মুছে ভদ্রলোক দুনিয়ার গল্প শুরু করলেন। অধিকাংশই খুন, নাবালিকা হরণ, আর বিধবার সম্পত্তি ঠকানোর রোমাঞ্চকর গল্প। পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অধঃপতনের জন্য অনুযোগের আর শেষ ছিল না তাঁর। তিনি নিজের কথাতেই ব্যস্ত। আর আমরা দুজন, অর্থাৎ আমি আর নীল যে এতক্ষণ ওঁর সামনে নীরবে বসে আছি সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। আমার মনে হয়েছিল, অবাঞ্ছিত আমাদের তিনি তেমন কোন মূল্যই দিতে চান না। ভদ্রলোকের এই অহঙ্কারী মেজাজটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তবু ওঁর দিকে ভালো করে না তাকিয়ে পারি নি।

নিপাট ভালো মানুষের মত মুখে একটা অদ্ভুত বোকামী ছড়িয়ে রয়েছে। মাথা জোড়া বিশাল টাক অচঞ্চল মরুভূমির মত। রুক্ষ

না, তৈলাক্ত। সেতারের ছেঁড়া তারের মত দু'একটা সাদা চুল সামনের দিকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মরুভূমিটা ঘোড়ার খুর-এর মত অর্ধবৃত্তাকারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে পিছ-নাংশে। মনে হয় সিংহীমশাই প্রাণপণে ঝোপের বেড়া দিয়ে টাকের সীমানা আর বাড়তে দেবেন না ঠিক করেছেন। সাদা ঘোলাটে মার্বেলের গুলির মত চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসার তালে রয়েছে। অত বড় চোখ, কিন্তু বুদ্ধির তেমন ছাপ পাওয়া যায় না। বড়ির মতো গোল নাকের নিচে কর্পোরেশনের নোংরা ঠেলা ব্রাশের মত ঝাঁটা গোঁফের কি বাহার! নেই-থুতনীই বলা যায়। কারণ সামান্য একটা রেখা ছাড়া গলা আর থুতনী মিশে সব একাকার। পুলিসী মোটা য়ুনিফর্মের আড়ালেও অমন মেদের আধিক্য চেপে রাখা যায় না। পেটের মাপটা ছাপ্পান্ন-টাপ্পান্ন বোধ হয় ছাড়িয়ে যাবে। সব থেকে যেটা বিরক্তিকর, সেটা হল ওঁর একঘেয়ে বক-বকানি। বকতে শুরু করলে থামতে চান না। আর তার অধি-কাংশই নিজের বাহাদুরী সম্বন্ধীয়। পরে জেনেছিলাম, পুলিসী লাইনে উনি তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। কোন জটিল কেস হলে ত প্রশ্নই নেই। সাধারণ কেসেও বিশেষ তৎপরতা দেখাতে পারেন না। আমার মনে হয় ঐ বিশাল পাহাড়ের মত দেহ নিয়ে চোর-টোর ধরা সম্ভব না। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পৌঁছতে অপরাধী অনেক আগেই নিপাত্তা হয়ে যাবে। এবং যায়ও। তাই আজও সাধারণ ইন্সপেক্টর থেকে উপরে ওঠার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে নি। ভদ্রলোক যখন নিজে থেকে আমাদের সম্বন্ধে কিছুই কৌতূহল দেখালেন না, তখন সত্যেনদাই বাধ্য হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আর সেই আলাপ করানোই হল কাল। কারণে অকারণে ভদ্রলোকের আবদার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল।

সত্যেনদার মুখে নীলের সামান্য পরিচয় পেয়েই ভদ্রলোক তাঁর

বিশাল শরীর নিয়ে কদমতলায় নৃত্যরত হস্তীর মতো সোফাটার ওপর বসে বসেই নাচ শুরু করে দিলেন। দৈত্যের থাবার মত বিশাল পাঞ্জা দিয়ে নীলের হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন—কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! এমন একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, ভাবতেই কেমন শিহরণ হচ্ছে। কাগজে তোমার, ভায়া হে, তোমাকে আর আপনি বললুম না—আমার থেকে অনেক ছোট ত—তা আপত্তি নেই ত?

হালকা হেসে নীল বলেছিল—বেশ ত, বেশ ত—তাই বলুন না।

আগের কথার রেশ টেনে সিংহীমশাই বলেছিলেন—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম—মনে পড়েছে। কাগজে তোমার কীর্তিকলাপ পড়ে মনে হয়েছিল জিনিয়াস। এ রকম ইয়াংম্যানরা পুলিসে না এলে ক্রিমিন্যালরা ঢিট হবে না। সেদিন থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হয়েছিল।

এই সময় ফস্ করে আমি বলে ফেলেছিলাম ভয়ঙ্কর কথাটা এক্ষেত্রে ঠিক—

মার্বেলের গুলি অগ্নিবর্ণ হয়ে আমার দিকে তেড়ে এসেছিল—এ ছোকরাটি কে দাদা?

উত্তরটা নীলই দিয়েছিল--আমার বন্ধুও বলতে পারেন, ভাইও বলতে পারেন।

ঠোঁটের কোণে এক চিলতে অনুকম্পা আর তাচ্ছিল্য মিশিয়ে উনি প্রশ্ন করেছিলেন—ভয়ঙ্করটা হবে না কেন শুনি?

—না, মানে—আমতা আমতা করে বলেছিলাম,—ভয়ঙ্কর কথাটার মধ্যে একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত থাকে তাই বলছিলাম।

—তা হলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্মটা কি হবে শুনি?

—আপনি প্রবল শব্দটা ব্যবহার করতে পারেন।

—ও দুটোর মানে একই—প্রবলও যা, ভয়ঙ্করও তাই। তা কি করা হয়?

—আমি একটা কলেজে পড়াই।

—মাস্টার? তা নইলে জ্যেষ্ঠ অনুজের তফাত বোঝ না—বাংলার নিশ্চয়?

—ঠিক ধরেছেন।

—ধরবই! হ্যাঁ, যা বলছিলুম।

সেই থেকে ভদ্রলোক আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। যতবারই এর পর দেখা হয়েছে, কিছু না কিছু কারণে খিটিমিটি লেগেছেই। নীল যে কেন এ লোকটাকে পাত্তা দেয় বুঝি না। এই হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধ্যেয় কোথায় একটু আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে নীলের সঙ্গে আড্ডা দেব, তা না, এখন হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে যেতে হবে কোথায় কি হয়েছে তার তদারকী করতে।

মনে মনে ইতস্ততঃ করছিলাম, যাব কি যাব না। বদখত একটা লোকের সঙ্গে সারাটা সন্ধ্যে কাটাতে হবে ভেবে নীলের ওপরই রাগ হচ্ছিল। এমন সময় নীল একেবারে তৈরি হয়ে এলো। বললে—নে চ—অনেক দেরি হয়ে গেল।

—কিন্তু কোথায় তা ত বলবি?

—বললাম না—নেমন্তন্ন। শ্রীধর বাই লেনের রামতনু লাহিড়ীর বাড়ি। ওঁর মেয়ের বিয়ে। বেশি দেরি করলে আবার সিম্পল লায়ন ক্ষেপে যাবে।

—ওর নাম সিম্পল লায়ন না দিয়ে বেবি এলিফ্যান্ট দেওয়া উচিত ছিল। তুইও যেমন—মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ হাসিল করে নিচ্ছে।

—ঠিক বলেছিস। ব্যাঙ বাদুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি আমি ফেলব তাকে গিলে। কিছু বুঝলি?

—বুঝলাম। অনেক দিন রহস্য-টহস্য না পেয়ে গোয়েন্দাপ্রবরের ব্যাঙ বাদুড় যা হোক কিছু একটা খেতে ইচ্ছে করছিল। এই ত?

পিঠের ওপর ঠাস করে একটা চাপড় কষিয়ে নীল বলল—কে

বলে শালা তোর বুদ্ধি খোলে নি ?

—তা সে যাই বলিস না কেন, তুই কিন্তু প্রোফেশনাল গোয়েন্দা হয়ে গেলি। চল, আর কি করা যাবে।

শীত-টীত ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় পৌনে আটটা।

রামতনু লাহিড়ীর গলিটা খুঁজে নিতে খুব বেশী বেগ পেতে হল না। গলির মোড়ে দাঁড়ালেই বিয়ের সাজে সাজা আলোকোজ্জ্বল বাড়িটাই প্রথম চোখে পড়ে। তবে রাস্তাটা খুব কম না। সেই নিউ আলিপুর থেকে শ্রীধর বাই লেন। নেহাত ছুটির দিন। তায় হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধ্যে। রাস্তায় লোকজনও কম। জ্যাম-ট্যামও বেশী পড়ে নি। নীলের হাতে স্টিয়ারিং থাকলে আর রাস্তা ফাঁকা পেলে পাখির মতো ও উড়ে যেতে পারে। এলোও তাই। প্রায় ঝড়ের মত। অন্যদিন কতক্ষণ সময় লাগত জানি না, কিন্তু সাড়ে আটটার আগেই আমরা বিয়ে-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

গলির মুখ থেকেই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। খুব একটা বেশী লোকের যাতায়াত চোখে পড়ল না। আশপাশের বাড়িগুলোর দরজায় বৃদ্ধ আর মেয়েদের ভিড়টাই প্রধান। কয়েকটা উঠ্তি বয়েসের ছেলেকে দেখলাম বাড়ির সামনে ভিড় করে রয়েছে।

গলিটা খুব একটা প্রশস্ত না। তবে বাড়িগুলোও মোটামুটি পুরনো ধাঁচের। বেশীর ভাগ বাড়িই পুরনো আমলের একটা ঠাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই প্রাচীন কলকাতার বংশধর।

এ গলির মধ্যে নিঃসন্দেহে রামতনু লাহিড়ীর বাড়িটাই সব থেকে বড়। কতটা বড় সেটা ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে বেশ কয়েক কাঠা জায়গা নিয়ে যে বাড়িটা দাড়িয়ে আছে

সেটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। লোহার গেট পেরিয়ে একটা ছোট্ট ঘাস-জমি। সেখানে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। অতিথি-অভ্যাগতরা ম্লান মুখে বসে রয়েছেন। প্রত্যেকের মধ্যে একটা ত্রস্ত চাঞ্চল্য। সেটা বেশ বোঝা যায় হাবভাবে। এদের অনেকেই নেমন্তন্ন না খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চান, সেটা একটা ছোট্ট জটলা থেকেই জানা গেল। লোহার গেটটার সামনে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতর-বাড়ি থেকে কাউকেই তারা বাইরে যেতে দিচ্ছে না। আর তাই নিয়েই কয়েকজন বৃদ্ধের মধ্যে অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া।

ছিপছিপে লম্বা এক যুবককে পাকড়াও করে বৃদ্ধেরা চলে যাবার দাবি জানাচ্ছেন। বিব্রত যুবকটি কোনমতে তাঁদের আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্যে অনুনয়-বিনয় করে চলেছে।

নীল আর ওখানে অপেক্ষা না করে ভেতর-বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পিছন পিছন আমিও চলে এলাম। দরজার মুখেই আর একজন কনস্টেবল আমাদের পথরোধ করল—অন্দর জানা মানা হ্যায়, বাবুজী।

মৃদু হেসে নীল জিজ্ঞেস করল—কৌন মানা কিয়া? ইন্সপেক্টর সাহাব তো?

—জী হাঁ।

—ঠিক হ্যায়, বলে নীল পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে কনস্টেবলের হাতে দিয়ে বলল—এটা আপনার ইন্সপেক্টরকে পৌঁছে দিন।

কনস্টেবলটি সেটা হাতে নিয়ে যখন কি করবে ভাবছে, অর্থাৎ গেটে সে একা। ইন্সপেক্টরের হুকুম না পেলে গেট ছেড়ে যাবার উপায় নেই তার, অথচ নীলের হাবভাব আর চেহারা দেখে তাকে খুব একটা ফালতু ভেবে উড়িয়েও দিতে পারছে না—এমন সময় ভেতর থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে নীলকে জিজ্ঞেস করলেন—আপ-

নাদের ত ঠিক চিনলাম না। কোথা থেকে আসছেন ? মানে আজ এ বাড়িতে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে, তাই—

কনস্টেবলের হাত থেকে কার্ডটা ফেরত নিয়ে নীল সেটা যুবকটির হাতে দিয়ে বলল—আমি জানি। আপনি কাইণ্ডলি এটা ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে দিন। তাহলেই হবে।

যুবক কার্ডটি নিয়ে চোখ বুলিয়েই বলে উঠলেন—আই সি ! আপনিই মিঃ নীলাঞ্জন ব্যানার্জী ? একটু আগে মিঃ সিন্‌হা আপনাকেই ফোন করেছিলেন ?

ঘাড় কাত করে নীল সম্মতি জানাল।

—আসুন, আসুন আমার সঙ্গে—উনি আমাকে বলে রেখেছিলেন আপনি এলেই ওপরে নিয়ে যেতে।

তারপর কনস্টেবলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এঁকে ছেড়ে দিতে হবে। ইনি আপনাদের সিন্‌হা সাহেবের লোক।

কনস্টেবল একবার নীল আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

সাদা সাবেকী পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে একটা অদ্ভুত থমথমে নিস্তব্ধতা অনুভব করলাম। এত বড় বিয়ে-বাড়ি। লোকজনও নেহাত মন্দ হয় নি। কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। চেঁচিয়ে কথা বলতেও কাউকে শুনলাম না। সানাইয়ের আওয়াজও নেই। চিৎকার চেঁচামেচি দূরের কথা, মানুষের পায়ের শব্দগুলোও যেন থেমে গেছে। অদ্ভুত একটা চাপা বিষণ্ণতা মাঘের এই ভরা তিথির কুমারী রাতকে যেন হত্যা করছে বলে মনে হল।

দোতলার লম্বা বারান্দা পার হতে হতে দেখলাম, প্রত্যেকটা ঘরেই পর্দা ফেলা রয়েছে। কয়েকজন উৎসাহী মহিলার মুখ ক্ষণিকের জন্যে পর্দায় এসে দেখা দিয়েই লুকিয়ে গেল।

তিনতলার সিঁড়ির মুখেই দেখি একটা পাঁচ-ছ বছরের ফুটফুটে ছেলে। অবাক চোখে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনের

যুবকটিকে দেখতে পেয়েই ছেলেটা 'বাপি' বলেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল।

—ছিঃ বাপি, ও রকম কোর না। তুমি এখন মণির কাছে যাও।

সিঁড়ির পাশেই একটি ঘরের দরজা ঠেলে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের এক যুবতী বধূ বেরিয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েই ভেতরে চলে গেলেন।

তিনতলার সিঁড়িতে পা দিতেই চাপা কান্নার আওয়াজ পেলাম। এই প্রথম শোকের বহিঃপ্রকাশ। এতক্ষণ ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। একটা থমথমে ভাব। ঝড় যে বয়ে গেছে তার প্রমাণ এই কান্না। কিন্তু উথাল-পাতাল নয়। চাপা। সংযমে বেঁধে রাখার চেষ্টা। আওয়াজটা যে কোন ঘর থেকে আসছে বুঝতে পারলাম না। নীল ততক্ষণে অনেকগুলো ধাপ উপরে উঠে গেছে। অগত্যা আমিও তিনতলায় চলে এলাম।

ঘরে পা দিয়েই সর্বনাশের সংকেত পেলাম। প্রচুর ফুলটুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। দারুণ মিষ্টি একটা সুবাস ঘরের সর্বত্র ছড়ানো থাকলেও বুঝলাম, মৃত্যুর ঠাণ্ডা হাত একটু আগেই এই ঘরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও নীল থমকে দাঁড়ালো। আমার মতই ও এতক্ষণ নীরবে সব কিছু দেখতে দেখতে আসছিল। যে যুবকটি আমাদের নিয়ে আসছিলেন, তিনি এগিয়ে গিয়ে সোফার ওপর নিবিষ্টচিত্তে বসে থাকা সিংহীমশাইয়ের কানে কানে কিছু বললেন। ভদ্রলোক ঐ মোটা শরীরেও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন—আরে এসো এসো, নীল এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

মৃদু হেসে নীল এগিয়ে গেল বটে কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সারা ঘরটাকে ও চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস ও নিমেষের মধ্যে মনের পর্দায় এঁকে নিচ্ছে।

লাহিড়ীরা উচ্চবিত্ত নিঃসন্দেহে। এবং বনেদী। সারা বাড়িতে

তার নমুনা আছে। কিন্তু এ ঘরটা একটু আলাদা। বনেদীয়ানার স্টাইলের মধ্যেই অনেকটা জায়গা জুড়ে আধুনিকতার ফ্যাশান। দেওয়াল, সিলিং, ঘরের বড় বড় জানলা। পুরনো আমলের বড় বড় চৌকো সাদা কালো পাথরের ছককাটা মেঝেয় বনেদী স্টাইলের ছাপ। কিন্তু তারই সঙ্গে রয়েছে আধুনিক কালের সোফা সেট, খাট-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব। মায় জানলার পর্দাগুলোরও মধ্যে বর্তমান ফ্যাশান বিদ্যমান। এ ঘরের সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা, সেটা হল একটা বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম। বিরাট বলছি এই কারণে, চট করে এতো বড় অ্যাকোয়ারিয়াম দেখা যায় না। দশ বাই তিন ফুট ত হবেই। খাটের ঠিক পাশেই দেওয়াল কেটে সেট করা, বিশেষ কায়দায়। নানান রঙের অনেক মাছ এলোমেলো খেলা করছে। আসলে সব কিছুর মধ্যেই বেশ রুচির ছাপ পাওয়া যায়। আর পরিচয় পাওয়া যায় সাচ্ছল্যের।

নীলের গলার আওয়াজে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। অস্ফুটে ও একবার উচ্চারণ করল—আশ্চর্য! দেখি, ও একদৃষ্টে অ্যাকোয়া-রিয়ামটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তা কেবলমাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। সিংহীমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—হঠাৎ জোর তলব কেন মিঃ সিন্‌হা? ঘটনাটা কি?

—খুব ইণ্টারেস্টিং এবং জটিল। ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

বলেই বোধ হয় আমার কথা সিংহীমশাই-এর মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ ঘটনার চাপা উত্তেজনায় তেমন খেয়াল করেন নি। আর পুলিস মানুষ। নিজের না বোঝা দুর্বলতার কথা ফস্ করে বলে ভুল বুঝতে পেরেই হঠাৎ হাউ-মাউ করে চিৎকার করে উঠলেন—এ্যয় কেয়া, কেয়া মাংতা হ্যায় ইধার?

বাজখাঁই চিৎকারে নীলও বোধ হয় চমকে উঠেছিল। ও বলে উঠল—আরে মিঃ সিনহা, ওকে চিনতে পারছেন না? ও আমাদের অজু।

চিনতে সিংহীমশাইয়ের আমাকে একটুও ভুল হয় নি তা জানি। কিন্তু কি যে এক বিজাতীয় বিদ্বেষ উনি আমার ওপর পুষে রেখেছেন বুঝি না। তাই কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারেন না। কে জানে কখন আবার কি ভুল ধরে ফেলব। বোধ হয় সেই কারণেই আমাকে চিনতে না চাওয়ার চেষ্টা। নীলয়ের জন্যই আমাকে কিছু বলতে পারেন না। গোলার মত চোখ দুটো দিয়ে আমাকে সর্বাঙ্গে ধ্বংস করতে করতে উনি বললেন—ও, তুমি! তা এখানে এসে তোমার কি লাভ? এসব ব্যাপারে তো তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই। বুঝলে নীল, এরা এসব দৃশ্য-টৃশ্য ঠিক সহ্য করতে পারবে না। তাই তোমাকে একলাই আসতে বলেছিলুম।

নীল মুখে কিছু বলল না। একবার কেবল ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা সিংহীমশাইয়ের মুখের ওপর স্থাপন করে বলল—বলুন, আপনার ইন্টারেস্টিং কেসটা কি?

চুপসানো বেলুনের মত হয়ে ঝাঁটা গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে উনি বললেন—অ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। বস। পৌনে সাতটা নাগাদ থানায় বসে একটা ফোন পেলুম। বিয়ের কনের রহস্যময় মৃত্যু। লাহিড়ী বাড়ি আমার চেনা বাড়ি। তাড়াতাড়ি চলে এলুম। এসে দেখি, এ বাড়ির একমাত্র মেয়ে। আজ তার বিয়ে। বিয়ের কিছুক্ষণ আগে মেয়েটি বাথরুমে যায়। কিন্তু আর বেরোয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া না পেয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখে, মেয়ে বাথরুমে মরে পড়ে আছে। এই হল মোদ্দা ব্যাপার।

সিংহীমশাইয়ের চাঁছাছোলা বর্ণনা থামলে নীল জিজ্ঞেস করল—আপনাকে কে ফোন করেছিল?

—সেটা নাকি কেউই জানে না।

—দরজা খোলবার আগে ফোন করেছিল, না পরে?

—এই রে, তা ত জিজ্ঞেস করা হয় নি—বলেই তিনি উঠতে

যাচ্ছিলেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে সব পরে হবে। বিয়ে কখন হবার কথা ছিল? মানে লগ্নটা কখন, তা জেনেছিলেন?

—হ্যাঁ জেনেছি। সাতটা চুয়ান্ন থেকে রাত এগারোটা বাইশ।

—কটা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়?

—ডাক্তার বলেছে-- সোয়া ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে। কারণ ঐ সময়েই নাকি মেয়েটা বাথরুমে ঢুকেছিল।

—সেটা কে দেখেছিল?

—প্রত্যেকেই ঐ সময়টা বলছে। বিশেষ করে মেয়েরা।

—মেয়েটির কে কে আছে?

—মা নেই। আর সবাই আছে।

—বর এসেছে?

—হ্যাঁ। সাড়ে সাতটা নাগাদ।

—ঠিক আছে, চলুন। বডিটা একবার দেখা যাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল।

ধীরে ধীরে বাথরুমের দিকে ওঁরা এগিয়ে গেলেন। অ্যাটাচাড্ বাথ। বাথরুমের দরজার সামনে গিয়ে ওঁরা থেমে গেলেন। লালের ওপর সবুজ আর ইয়ালো আকারের কাজ করা ভারি সিল্কের পর্দাটা নিথর হয়ে ঝুলছে। দরজাটা খোলাই ছিল। পর্দা ঠেলে ওঁরা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল, দূর ছাই যাব না। সিংহীমশাইয়ের অপমানটা আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু কেমন যেন আমারও ওঁকে ইগ্নোর করার জেদ চেপে গেল।

ঝকঝকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে লাল টকটকে গোলাপের মত পড়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। চমকে উঠলাম। গোলাপের উপমাটা দিয়ে আমি ভুল করি নি। সত্যিই যেন সদ্য-ফোটা রক্ত-গোলাপ। নীলের দিকে তাকালাম। ওকেও মুহূর্তের জন্য কেমন

বিমনা হতে দেখলাম। বোধ হয় এ দেখাটা আমার ভুল না। এমন সুন্দর একটা মেয়েকে দেখে আমার বা নীলের মত যুবকদের বিমনা হতে দোষ নেই। মেয়েটিকে দেখে মনে হল, বছর তেইশ চব্বিশের মধ্যেই ওর বয়েস। গায়ের রঙটা আশ্বিনের রোদের মত। মুখের মধ্যে এখনও যেন একটা রক্তিম উচ্ছ্বাস লেগে আছে। কপালের দু'পাশ থেকে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে চন্দনের ফোঁটা। কপালের ঠিক মধ্যিখানে কুমকুম দিয়ে এঁকেছে একটা পদ্ম। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে। মনে হয় মেয়েটির জ্ঞান ফেরাবার জন্য বাড়ির লোকেরা হয়ত জলের ঝাপটা দিয়েছিল। চন্দনের ফোঁটা-গুলো একটু ঝাপসা। কোথাও বা ধুয়ে গেছে। রক্তের মত লাল বেনারসী। ওর ঐ উজ্জ্বল গৌর শরীরে লাল বেনারসীটা কি অপূর্বই না লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এমন একটা শরীরকে সাজাবার জন্যই বুঝি বেনারসীটা তৈরি হয়েছিল। মাথায় লাল ওড়নাটা খসে পড়েছে। সিঁথি থেকে কপালে আটকে রয়েছে মুক্তোর টিক্‌লি। ম্যাচিং সেটে হার, কানের দুল। বাহু আর মণিবন্ধে ঐ সেটেরই অলঙ্কার। খুব একটা কাটা-কাটা চোখ নাক মুখ, এসব না। কিন্তু সব মিলিয়ে অনবদ্য। নীরবে ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখতে থাকলাম। কেননা আমি যুবক। আর রূপের প্রতি অনুরক্ত নয় এমন যুবক কে আছে?

কিন্তু বাদ সাধবার মত জগতে কেউ কেউ নিশ্চয় আছে। আমার নীরব রূপসুধা পান করাটা বোধ হয় সিম্পল লায়নের পছন্দ হল না। বিশ্রী কর্কশ পুলিসী গলার আওয়াজ পেয়ে আমার বিমোহন ভাবটা কেটে গেল। সিংহীমশাইয়ের সিংহনাদ শোনা গেল—কি হে নীল, কিছু বুঝলে?

নীলের কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। পরিচিত এক ভঙ্গী বুঝিয়ে দিল ওর তন্ময়তা। সেই এক ভঙ্গী। সেই এক ধরনের দাঁড়ানোর কায়দা। বুকের মাঝামাঝি হাত দুটো ভাঁজ করা। ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের ওপর ন্যস্ত রেখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

ঘুমন্ত লাল পরীটির দিকে। সিংহনাদ ওর কানে যায় নি, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি ওর মনের মধ্যে এখন হাজারটা প্রশ্ন এলোমেলো ছোটাছুটি করছে। সিংহীমশাই বোধ হয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এবার আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। একটু আগেই উনি আমায় বেশ অপমান করেছেন। আমিও শোধ নিলাম—ওঁকে যখন নিজে থেকেই ডেকে এনেছেন, দয়া করে ওঁকে ওঁর মতোই কাজ করতে দিন।

সিংহীমশাই কটমটিয়ে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বুঝতে পারলেন নীলকে বিরক্ত করলে ওঁর নিজেরই ক্ষতি। অধৈর্যে সিংহীমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিগারেট ধরিয়ে আবার ফিরে এলেন। হঠাৎ নীল প্রশ্ন করলে—আচ্ছা মিঃ সিন্‌হা, মেয়েটিকে আপনি এসে এইভাবেই দেখেন, না?

—হ্যাঁ।

—তখন এখানে আর কেউ ছিল?

—থাকবে না মানে? সে ত এক ক্রাউড-সিন মশাই। রাজ্যের ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সব এসে ঘরটার মধ্যে ভিড় জমিয়েছে। এখনও কি এ রকম ফাঁকা থাকত? সব হটিয়ে দিয়েছি পাশের ঘরে।

—হুঁ। আচ্ছা, মেয়েটি যে মারা গেছে আপনি বুঝলেন কেমন করে?

—নাড়ী টিপে। অবশ্য এদের হাউস-ফিজিসিয়ানও তাই বলছেন।

—আর কিছু বলেন নি তিনি?

—কি?

—এই কেমন ভাবে মারা গেল? এইচ ডাবলু ডাবলুর এইচটা?

—এইচ ডাবলু ডাবলু মানে?

পাশ থেকে আমি বলে ফেললাম—সে আপনি বুঝবেন না।

—তুমি থামো তো হে ছোকরা। এসব তদন্তের তুমি কি বোঝো? আমার উত্তর দেওয়া হল না। নীল বলল—এইচ মানে হাউ?

কেমন করে ?

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়ে সিংহ বললেন—নাথিং নাথিং। কিছুই বলতে পারল না। আরে টুকে পাস করা ডাক্তাররা কি নাড়ী দেখে বলতে পারে কেমন করে মারা গেল ? বিধানবাবু থাকলে—

—বিধানবাবু থাক, নীল বাধা দিল,—আপনার কি অনুমান ?

—হেঃ, মানে ইয়ে—এখনও ঠিক তেমন বুঝে উঠতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে মার্ডার-টার্ডার না—রক্তারক্তির ত কোন ব্যাপারই নেই। মনে হচ্ছে স্ট্রোক-ট্রোক হয়েই টেঁসে গেছে।

—আঃ, মিঃ সিনহা, মৃতা মহিলা সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলবেন না। তবে একটা কথা—মার্ডারই হোক বা অন্য কিছুই হোক, আপাতদৃষ্টিতে দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। দেন হাউ ?'

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে। আর ঐ হাউটির জন্যেই তোমাকে ডাকা।

—আচ্ছা মিঃ সিন্‌হা, ডাক্তারকে একবার ডাকা যাবে ?

—যাবে না মানে। বলেই উনি দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক দু' মিনিট পরেই ফিরে এলেন এক মধ্যবয়সী ভদ্র-লোককে নিয়ে।

এই দু' মিনিটের মধ্যে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নীল দুটো কাজ করল। প্রথমেই সে মৃতার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব নিবিষ্ট চিত্তে তার মুখে কিছু যেন খুঁজতে চাইল। তারপর একেবারে মুখের কাছে নাক নিয়ে গিয়ে ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কিছুর ঘ্রাণ নিল। এ কাজটা করতে ওর সময় লেগেছিল প্রায় দেড় মিনিট। আর আধ মিনিটের মধ্যে ও বাথরুম সংলগ্ন পিছনের দরজার নবটা ধরে মৃদু চাপ দিল। দরজাটা খুলে গেল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এমন সময় সিংহীমশাই-এর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ও দরজাটা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

ঘরে ঢুকেই সিংহীমশাই বললেন—এই ইনিই হচ্ছেন এ বাড়ির

ডাক্তার, মানে হাউস-ফিজিসিয়ান।

—হ্যাঁ, কি যেন নাম আপনার?

—ডাঃ অরিন্দম বসু।

ডাক্তার নিজেই উত্তর দিলেন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা। বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। প্রায় ছ' ফুটের মত লম্বা। একরাশ কালো কোঁকড়ানো মাথার চুল ব্যাক ব্রাশ করা। লম্বা জুলপি। মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের মধ্য দিয়ে বড় বড় চোখের উজ্জ্বল ভাষা নষ্ট হয় নি। তীক্ষ্ণ লম্বাটে নাক। দৃঢ় চিবুক। টকটকে উজ্জ্বল গায়ের রঙ। ভদ্রলোক ডাক্তার না হয়ে ফিল্ম আর্টিস্ট হলে মানাতো ভালো। ডাক্তারের গলার স্বরও বেশ মিষ্টি আর গম্ভীর।

—নমস্কার ডাঃ বাসু। নীল বেশ ভারিক্কি চালেই বলতে শুরু করল—আপনিই ত এঁদের হাউস-ফিজিসিয়ান?

—বলতে পারেন।

—বলতে পারেন কেন?

—এই কারণে, গত এক দেড় বছর আমি এ বাড়ির চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্ত আছি। তার আগে আমার বাবাই ছিলেন লাহিড়ী-বাড়ির একমাত্র চিকিৎসক।

—তা উনি এখন করছেন না কেন?

—প্রায় আশি বছর ওঁর বয়স। আর কতদিনই বা ডাক্তারী করবেন? অবশ্য ডাক্তারের অবসর বলে কিছু নেই। ডাক্তার আর অভিনেতারা সাধারণতঃ অবসর নেন না। এক রকম আমিই জোর করে—

—আচ্ছা ডাঃ বাসু, মৃতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করেন আপনি বলতে পারেন?

—তা কেমন করে বলব? খবর পেয়ে আমি এখানে চলে আসি। অবশ্য এমনিতেই আসতুম। কারণ আজ আমারও নেমন্তন্ন ছিল।

—আপনাকে ফোন করে কে ?

—সুতনু, মানে পাপড়ির দাদা।

—পাপড়ি !

—যাকে অত্যন্ত অসহায়ের মত আজ এইভাবে পড়ে থাকতে দেখছেন।

—আই সী। আচ্ছা, আপনি এসে কি দেখলেন ? অর্থাৎ কি ভাবে এঁকে আবিষ্কার করলেন ?

—যেমন ভাবে দেখছেন সেই ভাবেই। তবে তখন ছিল এ ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। এখন ফাঁকা।

সিংহীমশাই এক দাম্ভিক গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন—সব হটিয়ে দিয়েছি। এসে দেখি মশাই, একেবারে মাছের হাট বসে গেছে। একটা মেয়ে মরে গেল আর সারা বাড়ির লোকের মজার শেষ নেই। একটা লোককেও বাড়ির বাইরে যেতে দিই নি। এক এক করে সব ক'টাকে ক্রস করে তবে ছাড়ব।

—আপনি কি এখনও সবাইকে আটকে রেখেছেন মিঃ সিন্‌হা ?

—রাত বারোটার আগে কাউকে ছাড়ব ভেবেছেন ?

—পাবলিক যে কেন আপনাকে এখনও ঘেরাও করেনি সেটাই আশ্চর্যের। এক কাজ করুন, প্রত্যেকের নামঠিকানা রেখে ছেড়ে দিন। বলে দিন, দরকার পড়লেই থানায় ডেকে পাঠানো হবে।

—কিন্তু ?

—কিন্তু কি ? আর য়ু ডেফিনিট যে এটা মার্ডার কেস ?

—না। মানে—আমতা আমতা করেন সিংহীমশাই। কেসটা সাসপেক্টেড ত ?

—কেমন করে বুঝলেন ?

—মনে হচ্ছে।

—আপনার অযথা কি মনে হচ্ছে, না হচ্ছে তা দিয়ে এতগুলো ভদ্রলোককে আটকে রাখবেন ? বেড়ে মজা ত ! এক্ষুণি ছেড়ে দিন

সবাইকে। এইভাবে আটকে রেখে সন্দেহটা ত আপনিই লোকের মধ্যে বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

—তাহলে ছেড়েই দি—উনি চলে যাচ্ছিলেন। আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন—এখনও ভেবে দেখো।

—নিজে ভেবে যা করবার নিজেই করুন। আমাকে আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

সিংহীমশাই বেরিয়ে গেলেন। নীল আবার প্রশ্ন শুরু করল—আচ্ছা ডাক্তার বাসু—

—হ্যাঁ, বলুন।

—পাপড়ি দেবীর মৃত্যুর কারণ আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন?

—অ্যাট আ গ্লান্স কিছু বলা যায় না। ফেলিওর অব হার্ট—

—বাট হাউ?

—বলতে পারছি না।

—হাউস-ফিজিসিয়ান হিসেবেই জিজ্ঞেস করছি। পাপড়ি দেবীর কি হার্ট-এর অসুখ ছিল?

—না, আমার জানা নেই।

—আপনার কি মনে হয়? কেসটা নরম্যাল?

—দেখে ত তেমন কোন অ্যাবনরম্যাল কিছু পাওয়া গেল না।

—ঠিক কথা। কিন্তু হঠাৎ এভাবে মারা যাবেনই বা কেন? হার্ট অ্যাটাক?

—হতেও পারে।

—আপনি কি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পাবেন?

—না। কেন না, কেসটা ত এখন পুলিসের আণ্ডারে। তা ছাড়া ডেফিনিট না হয়ে কিভাবে ডেথ সার্টিফিকেট দোব?

শেষ কথাটা বোধ হয় সিংহীমশায়ের কানে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠলেন—আচ্ছা নীল, এটা সুইসাইডাল কেসও ত হতে পারে।

—পারে না, তা বলছি না। কিন্তু বিয়ের রাতে এমন সেজেগুজে কোন মেয়ে কি সুইসাইড করে?

—না করার কি আছে? সিংহীমশাই গলায় জোর তুলে বলেন —আলবৎ করতে পারে। অ্যাণ্ড আই ডাউট সো।

—হুঁ। ইউ ডাউট সো। আচ্ছা ডাঃ বাসু, যদিও এটা আপনার জানার কথা না, তবু জিজ্ঞেস করছি, পাপড়িদেবী কি নিজের ইচ্ছেতে, আই মীন এটা কি লাভ ম্যারেজ, অর—

—হ্যাঁ। এটা লাভ ম্যারেজ। ডাক্তার বেশ জোর দিয়েই বললেন—আমি জানি এটা লাভ ম্যারেজ। এবং এই বিয়ের ব্যাপারে এদের মধ্যে বেশ কিছু পারিবারিক বিদ্বেষ-টিদ্বেষও জমে আছে। বলতে পারেন পারিবারিক অনিচ্ছাতেই এ বিয়ে হচ্ছিল। নইলে পাপড়ি বলেছিল, এ বাড়ি ছেড়ে উদ্দালকের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

—উদ্দালক মানে যার সঙ্গে পাপড়িদেবীর বিয়ে হচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—তিনি এখন কোথায়?

—মাথায় হাত দিয়ে নিচে বসে আছেন।

—তা হলেই দেখছেন মিঃ সিন্‌হা, পাপড়িদেবীর আত্মহত্যার কোন কারণ থাকতে পারে না। যে মেয়ে এক রকম সবার অমতে নিজের মনোমত পাত্রকে বিয়ে করতে চলেছিল, তার পক্ষে বলা নেই কওয়া নেই, আত্মহত্যা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে কি?

—এতো ফ্যাঁকড়া আমি কোত্থেকে জানব? সিংহীমশাই যেন সাফাই গাইবার চেষ্টা করলেন। এই মুহূর্তে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল যে এসব তো আপনারই জানবার কথা। নেহাতই ঝগড়া বাধার ভয়ে আমি চুপ করে গেলাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সিংহীমশাই বললেন—তবে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করি নি। করলেই সব

বেরিয়ে পড়ত।

আচমকা নীল একটা অন্য ধরনের প্রশ্ন করল ডাক্তারকে, আচ্ছা ডাঃ বাসু, ক্লোরোফর্মের গন্ধ সাধারণতঃ কতক্ষণ থাকতে পারে একটা ঘরে?

—ক্লোরোফর্ম? বন্ধ ঘরে?

—ধরুন তাই।

—বন্ধ ঘরে একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার করলে প্রায় ঘণ্টা চার-পাঁচ থাকতে পারে।

—আর যদি দরজা জানলা খোলা থাকে?

—ঘণ্টাখনেক একটা হালকা রেশ থাকলেও থাকতে পারে।

—পাপড়িদেবী কতক্ষণ আগে মারা গেছেন বলে মনে হয়?

ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—এখন প্রায় সোয়া ন'টা। তার মানে, একজ্যাক্ট আওয়ার এইভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় ঘণ্টা তিন কি আড়াই আগে উনি মারা যেতে পারেন।

—তার মানে—নীল পালটা প্রশ্ন করল—ওঁকে যদি কেউ ক্লোরোফর্ম করে থাকে তাহলে সে গন্ধ কি এখনও থাকতে পারে?

—না বোধ হয়। কারণ ঐ যে দেখছেন পাশের জানলাটা। ওটা ত খোলাই রয়েছে। দু'আড়াই ঘণ্টায় গন্ধটা উড়ে গেছে। তা ছাড়া যে পরিমাণে এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ক্লোরোফর্মের গন্ধ বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

—বেশ। গন্ধ নয় উড়ে গেল। কিন্তু প্রমাণটা যে রয়ে গেছে।

—প্রমাণ? কি প্রমাণ? সিংহীমশাই লাফিয়ে উঠলেন।

—মৃত্যুর আগে পাপড়িদেবীকে জোর করে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে।

—কি করে বুঝলে?

—ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, ভদ্রমহিলার নাকের

উপর কয়েকটা সরু ছুঁচ ফোটানোর মত কালো স্পট—যেটা সাধারণতঃ ক্লোরোফর্ম থেকেই হতে পারে।

—ইস, শালা আমি কি গর্দভ!

—উত্তেজিত হবেন না মিঃ সিন্‌হা, আরো আছে। একটি মেয়ে, একটু পরেই যে ফিটফাট সেজে বিয়ে করতে বসবে, তার খোঁপাটা ওভাবে ভেঙ্গে এলোমেলো হয়ে যাবে কেন? কপালের আর গালের চন্দন ঘষে যাবে কেন?

—হতে পারে। আমি ত এসে দেখলুম, এরা সবাই মিলে মেয়েটার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

—বেশ। তাহলে গলার মালাটা ছিঁড়ল কেন?

—সেটা হয়ত মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে গিয়ে কারো হাত লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে।

—ছিঁড়ে যেতে পারে, কিন্তু থেঁতলে ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে ত যেতে পারে না?

সিংহীমশাই একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—তা অবশ্য পারে না। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—ভালো করে দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন।

—অ্যাঁ, তাই নাকি! বলেই উনি তড়াক করে লাফিয়ে মৃতার ঘাড়ের কাছে হেঁট হয়ে দেখতে দেখতে বললেন—ঠিক বলেছ নীল। ইউ আর সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট।

—এখানেই কিন্তু শেষ হল না। আরও আছে। ডাঃ বাসু—

—বলুন।

—আপনারা যখন ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দেন তখন কিভাবে দেন?

—সাধারণতঃ ভেন না পাওয়া গেলে অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান মানুষ হলে ভেন পেতে একটু অসুবিধা হয়—তখন আমরা প্রথমেই ইনজেকশান দেবার পজিশান ঠিক করে নিয়ে একদিক শক্ত করে বেঁধে নিই।

তারপর ভেনটা ভিজিবল্ হলে তবেই দিতে পারি।

—ঠিক তাই। আমিও সেটাই আঁচ করেছিলাম। তাহলে ডাক্তার বাসু, এবার ভালো করে দেখুন তো, পাপড়িদেবীর ডান হাতের কনুইয়ের ভাঁজটা—

ডাঃ বাসু আর নীলকে শেষ করার অবসর দিলেন না। তিনি অবিলম্বে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন —মিঃ ব্যানার্জী, সত্যিই আপনার দেখার মত চোখ আছে। ডাক্তার হয়েও যেটা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, সেটা আপনার চোখে ধরা পড়েছে। অবশ্য আপনাদের চোখ আলাদা, আর আমি এ দিকটা মোটেই ভাবতে পারি নি। এই ত স্পষ্ট নিড্ল প্রিকিং-এর দাগ। এখনও জায়গাটা ঈষৎ ফুলে রয়েছে। বাইসেপের ওপরে স্পষ্ট দড়ি বাঁধার চিহ্ন।

ডাঃ বাসুর দেখাদেখি সিংহীমশাইও ঝুঁকে পড়লেন। কি বুঝলেন জানি না। বলে উঠলেন—তোমাকে না কি বলব মাইরী। তুমি না একটা জিনিয়াস। তুমি না একটা—, ঐ জন্যেই না তোমাকে এত প্রেম করি।

উৎসাহের মাথায় সিংহীমশাই যা খুশি তাই বকে চললেন। নীল সিংহীমশায়ের আবেগে এক ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে বলল—তা হলে এ দিয়ে কি প্রমাণ হয় মিঃ সিন্‌হা ?

—প্রমাণ ? প্রমাণ মানে ইয়ে, বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পয়জন ইনজেক্ট করে মেয়েটাকে মারা হয়েছে।

—এবং, নীল বললে, সেটা এমনই একটা ওষুধ যেটা নাকি ভেনে চালান করতে হয়। তাই না ?

—তাই-ই ত ! তাহলে দেখ, আমার অনুমানটা মিথ্যে নয়। লাশ দেখেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, এটা অ্যাবনরম্যাল কেস। তারই জন্যেই ত সব ক'টাকে আটকে রেখেছিলুম।

—এখন সবাইকে ছেড়ে দিয়েছেন ত ?

—তুমি যখন অত করে বললে—

ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাইরে থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এলো। কেউ যেন চিৎকার করে বলছে—না না, এসব চলতে পারে না। পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? আমাদের মেয়ে মারা গেল, আর বাড়ির লোককে সেখানে যেতে দেবে না—

চেঁচামেচি আর হট্টগোল শুনে আমরা প্রায় সকলেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। সিংহীমশাই প্রথমেই সিংহনাদ করে উঠলেন—কি? ব্যাপারটা কি? এত হম্বিতম্বি কিসের?

পাপড়ির ঘরের চৌকাঠের কাছে তখন ছোটোখাটো একটা জটলা। তার মধ্যে বেশীর ভাগই বয়স্ক আর মহিলা। সিংহীমশাই-এর হঠাৎ ঐ রকম ধমকে তারা ক্ষণিকের জন্য একটু শান্ত হলেও এক প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন—আপনাদের কি ব্যাপার বলুন ত, ইন্সপেক্টরবাবু?

সিংহীমশাইয়ের মেজাজ তখন অন্য রকম হয়ে গেছে। ভারিক্কি পুলিস অফিসারের মত বললেন—কিসের কি ব্যাপার?

ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক গলার স্বর উঁচু রেখেই বললেন—আপনারা পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আমাদের বাড়ির মেয়ে। আজ তার বিয়ে; হঠাৎ সে মারা গেল। অথচ আমাদের সেখানে যেতে না দিয়ে আপনারা করছেনটা কি শুনি?

—আপনি কে? সিংহীমশাইয়ের দারোগাসুলভ বাজখাঁই আওয়াজ।

ভদ্রলোক তাতে ঘাবড়ালেন না। বললেন, আমি কনের কাকা।

—তা, অত চেঁচাবার কি হল?

—চেঁচাবো না মানে? কি বলছেন কি মশাই?

—শাট আপ্! বলে সিংহীমশাই বোধ হয় রাগের মাথায় কিছু করেই বসতেন। মধ্যস্থতা করল নীল। সে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল—দয়া করে আপনারা একটু চুপ করুন। এ ভাবে

চেঁচামেচি করলে কারোরই কোন লাভ হবে না।

নীলের কথা বলার ভঙ্গিতেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, পরিবেশটা কিন্তু অনেক শান্ত হল। তবু সেই পূর্বের ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক পরিপূর্ণ শান্ত হলেন না। মোটামুটি রাগের ঝাঁঝটা গলায় রেখেই বললেন—কেন? শান্ত হব কেন? এটা কি শান্ত হবার সময়? না সমস্ত পরিবেশটা শান্ত হয়ে বসে থাকার মত?

নীল চট করে রাগে না। এখনও রাগল না। শান্তকণ্ঠেই সে বলল—তা হলে আপনারা কি করতে চান বলুন?

—আমাদের মেয়ে, আমরা তার কাছে যেতে চাই। একবাড়ি নিমন্ত্রিত লোকের কাছে আমরা কোন জবাব দিতে পারছি না। খবরটা শুনে পর্যন্ত দাদা অজ্ঞান হয়ে গেছেন—এর পরেও আপনারা বলবেন আমাদের শান্ত হয়ে বসে থাকতে?

—দেখুন, অযথা আমাদের ওপর রাগ করে লাভ নেই। আমরা ত এসেছি এই মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে।

—রসিকতা করছেন? মৃত্যুর পর আবার কি সাহায্যের ব্যাপার আসতে পারে?

—আপনি উত্তেজিত বলে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না। একটু চিন্তা করে দেখুন ত, একটি মেয়ে, একটু পরেই যার বিয়ে, ভুম করে সে মারা গেল কেন? ভেবেছেন কি?

—ভাবতে আর দিলেন কোথায়? সব ভাবনা যে আপনারাই ভাবতে শুরু করে দিলেন। এইজন্যেই বলেছিলুম, পুলিসে খবর দিও না। আমার কথা কেউ শুনল না। ভুম্ করে পুলিস এনে হাজির।

—খবর না দিলেও কিন্তু পুলিস আসত। কারণ এ ক্ষেত্রে পুলিসের আসার অধিকার আছে।

—কেন? কেন?

—ডাঃ বাসু, কারণটা আপনিই বলে দিন।

বোধ হয় ডাক্তারবাবু বলতে ইতস্ততঃ করছিলেন। সেই অবসরে

সিংহীমশাই বলে উঠলেন—কেন আবার কি ? এটা মার্ডার কেস। তাই। আপনাদের মেয়েকে কেউ খুন করেছে, তাই পুলিসের রাইট আছে আসার। রাইট আছে যতক্ষণ খুশি ঘরে ঢুকতে না দেবার।

শুধু এই ক'টা কথাতেই মন্ত্রের মত কাজ হল। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, অদ্ভুত এক মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাঁদের মধ্যে। 'অ্যাঁ, খুন ?' 'কি সর্বনেশে কথা!' 'কেন যে ছাই এসেছিলুম মরতে ?' 'লাও এবার ঠেলা সামলাও' ইত্যাদি নানা রকম মন্তব্য শোনা গেল অস্ফুট গুঞ্জনের মাধ্যমে। কেউ কেউ সরে পড়ার তালে ছিলেন। সিংহীমশাইয়ের চিৎকারে তাঁদের আর সরে যাবার সাহস হল না। সবাই কেমন বোবা আর নিথর হয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যে ভদ্রলোক এতক্ষণ গর্জন করছিলেন তিনিও কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন—কি বলছেন ডাঃ বাসু ? পাপড়ি মানে--খুন হয়েছে ?

এবার নীল ধীরে ধীরে বলল—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় কেউ তাকে খুন করেছে।

—কে ?

—তা ত জানি না। এখনও পর্যন্ত আমরা কেবল বুঝতে পেরেছি তাকে কেউ হত্যা করেছে। কে, কেন—এসব আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি। আপনারা মৃতা পাপড়িদেবীর নিকট-আত্মীয় হয়ে নিশ্চয় চাইবেন, যে তাকে খুন করেছে তার শাস্তি হোক।

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ পালটে গেলেন। কোথায় বা সেই হম্বিতম্বি আর চিৎকার চেঁচামেচি। কেমন যেন বিহ্বলের মত বললেন--হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।

—তা হলে আপনারা এবার আমাদের একটু সাহায্য করুন।

—বেশ, বলুন কি করতে হবে ?

—আমি জানি এটা শোকের সময়। তবু যতদূর সম্ভব নিজেদের একটু শান্ত রেখে স্থির হোন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের

কাজ সেরে চলে যাব। তার আগে একটু জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন। অত্যন্ত সংক্ষেপে, কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আমরা জানতে চাই।

—বেশ, আমরা সবাই পাশের ঘরেই আছি। দরকার মত ডাকবেন।

আর একটা কথাও না বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাও উধাও হয়ে গেল।

ভোরের ঘুম আর মেয়েদের মন বোধ হয় একই রকম। একবার চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া কঠিন। গতরাত্রে লাহিড়ী-বাড়ি থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে নীল যখন চলে গেল তখন রাত প্রায় একটা। অত রাত্রে বাড়ি এসে আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রেখা, আমার নাছোড়বান্দা বোন। ওর হাত এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হাজার কৈফিয়ত দিলেও রেহাই পাওয়া যায় না। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুমে তখন আমার চোখ জ্বালা করছিল। ভেবে-ছিলাম অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠব। রেখাকে বলে রেখেছিলাম যেন ডাকাডাকি করে আমার ঘুম না ভাঙ্গায়।

রেখা ঘুম ভাঙ্গায় নি। কিন্তু পাশের বাড়ির ভুবনবাবু কোথা থেকে একটা মোরগ কিনে এনে পুষতে আরম্ভ করেছেন। একটা মোরগ কেউ পোষে কিনা আমার ধারণায় নেই। এরকম বিদ্‌ঘুটে কথাও কোনদিন শুনি নি।

সে যাই হোক, যে যার পছন্দমত শখ করতে পারেন। তাতে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের এই অবলা জীবটির সময়-জ্ঞান খুবই কম। কাকডাকা ভোর থেকে উনি ঘাড় গলা ফুলিয়ে এমন ডাকাডাকি আরম্ভ করবেন তখন মনে একটি মাত্র চিন্তাই উদয় হয়। শুনেছি মুরগীর থেকে মোরগের মাংসই খেতে

সুস্বাদু। ভুবনবাবুকে একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে আছে ওঁর এইরকম শখের কারণ কি ?

আজ ভোরে, ভুবনবাবুর সেই মোরগ বাবাজীর কি মরজি হয়েছিল কে জানে ? মাথার কাছে খোলা জানলার কপাটের মাথায় বসে বিকট চিৎকারে আমার যুবতী ঘুমটাকে খুন করে দিয়ে গেছে। হুস-হাস শব্দ করে ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ঘুম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অভিমানীর মান ভাঙ্গে নি।

চিন্তাহীন মানুষ বাঁচতে পারে না। এক এক করে গত রাতের সব কথা মনে পড়তে থাকল। প্রথমেই মনে পড়ল পাপড়ির মুখখানা। কি সুন্দর মিষ্টি দেখতে। তার ওপর বিয়ের সাজে ওকে কি দারুণই না লাগছিল। মাঝে মাঝে আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি না মানুষ মানুষের ওপর এত নৃশংস হয় কেমন করে ?

অবশ্য ভুবনবাবুর মোরগের ওপর যে আমার মাঝে মাঝে নৃশংস হতে ইচ্ছে করে তার একটা অন্য কারণ আছে। মানুষ অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। কিন্তু ঘুমের মত পরম শান্তির সময়টাকে কেউ তছনছ করে দিলে তাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু পাপড়ি! কি তার অপরাধ ? কি সে এমন ক্ষতি করেছিল কার ? জীবনের পরম মূল্যবান এবং শ্রেষ্ঠ সময়ে তাকে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হল। কত আশা আর সুখের স্বপ্নে মশগুল হয়ে তার একান্ত প্রিয় মানুষটার কাছে সে যেতে চেয়েছিল। শুনলাম, এই নিয়ে অনেক পারিবারিক অশান্তিও সে সহ্য করেছে। সবকিছু বাধা অতিক্রম করে ঠিক পাবার মুহূর্তেই তাকে চলে যেতে হল মৃত্যুর নির্মম আকর্ষণে। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কী যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে, বুঝে উঠতে পারি না।

কাল পাপড়িকে দেখার পর থেকেই আমি ভাবছিলাম কি ওর মৃত্যুর কারণ ? নীলের বক্তব্য অনুসারে, অবশ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণও করিয়েছে এটা খুন। বিয়ের রাতে একজন যুবতী নারীর

খুন হবার কি-ই বা কারণ থাকতে পারে ?

পারে। হয়ত অনেক কিছুই কারণ আছে। কারণ না থাকলে খুনই বা সে হবে কেন ? এটাই ত ঘটনা। আর ঘটনা মানেই চরম সত্য। কিন্তু এই সত্যের পিছনে যে আরো এক লুক্কায়িত চরম সত্য আছে সেটাই ত এখন খুঁজে বার করতে হবে।

সিম্পল লায়নের পক্ষে এ খুনের কিনারা করা একেবারেই অসম্ভব, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। একটা জটিল খুনের কিনারা করতে মগজে কিছু ঘিলুর প্রয়োজন। সেটা সিংহীমশাইয়ের একেবারেই নেই। আর নেই জেনেই সিংহীমশাই নীলকে ডেকে নিয়ে গেছেন।

একে ত নীল বেশ কিছুদিন ধরে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে। যতক্ষণ না এই খুনের কিনারা করতে পারছে, ততক্ষণ ওর আর কোনদিকে মন থাকবে না। নতুন আর এক বোবা রোগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকবে।

তবে, প্রথমে আমি সিম্পল লায়নের ওপরে রাগ করলেও এখন ঠিক ততটা রাগ নেই। এত সুন্দর একটা মেয়েকে তার জীবনের আরো সুন্দর একটা মুহূর্তে যে এমন ভাবে তাকে হত্যা করতে পারে তার শাস্তি হওয়া দরকার। এর জন্যে যদি আরো কিছুদিন আমাকে নীলের গোমড়া মুখ দেখতে হয়, তাও সইব আমি। মনে মনে আমি নীলের সাফল্য কামনা করলাম।

কাল রাতের অনেক ঘটনাই আমার মনে পড়ছিল। এক এক করে সবাইকে জেরা করা। উদ্‌ভ্রান্ত উদ্দালকের মুখটাও মনে পড়ল। বেচারা কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে। আর হবেই বা না কেন ? ভালো-বাসার মানুষকে এভাবে হারাতে কে-ই বা চায় ? ভালো করে সে তেমন উত্তরও দিতে পারছিল না। বোকা তাঁতী সিংহীমশাইয়ের সামাজিকতাও বড় কম। ঐ অবস্থার মধ্যেও ওঁর জেরা করার কি ধুম। নীল না থাকলে উদ্দালক অত সহজে নিষ্কৃতি পেতো বলে মনে হয় না।

এত সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমি কিন্তু নীলকেই বারবার

লক্ষ্য করে গেছি। একমাত্র ডাক্তার অরিন্দম বাসু ছাড়া ও আর কাউকেই তেমন কোন প্রশ্ন করে নি। বোধ হয় ইচ্ছে করেই করে নি। ঐ অবস্থার মধ্যে পুলিসী জেরা চালানো বোধ হয় ওর নীতি-বিরুদ্ধ। এতটা হৃদয়হীন যে ও হতে পারবে না সেটা আমি জানতাম।

কাল ও কেবল সব কিছু দেখেছে। লক্ষ্য করেছে সবাইকে। ওর নজর এড়িয়ে যাবার মতো একটাও জিনিস ও-বাড়িতে আছে বলে আমার মনে হয় না।

দুটো জিনিস ও বারবার লক্ষ্য করছিল। বারবার ঘুরে ফিরে অ্যাকোয়ারিয়ামটার কাছে ঘোরাফেরা করছিল। অনেকক্ষণ ধরে মাছেদের খেলা দেখছিল। এমন কি, আমার বেশ মনে আছে একবার অ্যাকোয়ারিয়ামটার ডালা তুলে জলের ভেতরেও যেন কি খুঁজছিল। ওকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল ও যেন মাছের কত ভক্ত। যেন মাছই ওর জগতে একমাত্র প্রিয় বস্তু। ওর রকম-সকম দেখে সিংহীমশাইও বিরক্ত হয়ে একবার বলেই ফেললেন—আরে নীল, কি তখন থেকে অত রঙীন মাছ দেখছ? কলকাতা শহরে অমন মাছের খেলা তুমি অনেক দেখতে পাবে। এদের একটু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করবে না?

নীল যেন বড্ড বোকার মত কাজ করে ফেলেছে, এমন একটা করুণ মুখ নিয়ে এসে বলেছিল—মিঃ সিন্‌হা, যেখানে আপনি ক্রস করছেন সেখানে আমার কথা বলার কোন মানেই হয় না। ও আমি করলেও যা, আপনি করলেও তাই।

নীলের উত্তরে সিংহীমশাই মনে মনে পুলকিত হয়ে বলেছিলেন—সে ত নিশ্চয়ই। তবু তোমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে?

ঠোঁট টিপে নীল ক্ষণিকের জন্যে কি ভেবে বলেছিল—ঠিক আছে। প্রয়োজন হলে করব।

তারপর ও মাত্র দুজনকে প্রশ্ন করেছিল। প্রথম অতনু

লাহিড়ীকে। রামতনু লাহিড়ীর একমাত্র ভাই। মানে পাপড়ির কাকা। যে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে থাকাকালীন চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলেন। সিংহীমশাইয়ের জেরার মধ্যেই নীল প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী, পাপড়ি দেবীর বাথরুমের ও পাশের দরজাটা কিসের?

অতনুবাবু উত্তর দেবার আগেই সিংহীমশাই বলে উঠেছিলেন—আহা, কিসের আবার! ও ত ধাঙ্গড়দের আসার জন্যে।

ব্যঙ্গের সুরে নীল বলেছিল—ও, তাই নাকি? তা, ও দরজাটা কি সর্বদাই খোলা থাকে?

অতনুবাবু বলেছিলেন—না ত। আমি যতদূর জানি ওটা দিনে একবারই খোলা হয়। সকালে। অবশ্য মালতিই ভালো বলতে পারবে এ বিষয়ে।

—মালতি কে?—নীল জিজ্ঞাসা করেছিল।

—মালতি এ বাড়ির ঝি।

—তাকে একবার ডাকবেন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

একটু পরেই মালতি এসেছিল। চমকে উঠেছিলাম। মালতি এ বাড়ির ঝি? কে বলবে? না বলে দিলে বোঝার উপায় নেই। বছর চব্বিশের মধ্যেই বয়স। মাজা মাজা গায়ের রঙ। আঁটোসাঁটো টসটসে শরীর। যৌবনটা যেন দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শরীরে যে যে চড়াই উৎরাইয়ের কারুকার্য থাকলে একজন স্ত্রীলোক পুরুষের চোখে মনোহরা হয়ে উঠতে পারে, তার সব গুণটুকুই ছিল ওর দেহের বিভিন্ন অংশে। ঐ যে 'দৃষ্টিতে পঞ্চশরের জাদু', 'মদির কটাক্ষ', হেন তেন, সব কি বলে-টলে না, সে সবই ছিল ওর একজোড়া চোখে। সিংহীমশাইয়ের মত রসকষহীন মানুষও একটু যেন বিষম-টিষম খেলেন বলে মনে হল।

আমার মত নীল এত সব ভেবেছিল কিনা জানি না। তবে

ওকেও একটু ইতস্ততঃ করতে দেখলাম সম্বোধনের ক্ষেত্রে। আপনি বলবে, না তুমি বলবে। শেষ পর্যন্ত ভাববাচ্যেই বলল—বাথরুম-এর দরজাটা কি কাজে ব্যবহার হয় জানা আছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানি। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্যে প্রত্যেক দিন সকালে মেথর আসে ঐ দরজা দিয়ে।

গলার স্বরটা ঈষৎ ভাঙা ভাঙা। ঠাণ্ডা লেগেও এই ধরনের আওয়াজ হতে পারে। এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় দু' তিনজন অপরিচিত পুরুষ থাকার জন্য।

নীল আবার প্রশ্ন করেছিল—দরজাটা কি সর্বদাই খোলা থাকে ?

—না ত। সকালে মেথর পরিষ্কার করে চলে যাবার পর চাবি দিয়ে দেওয়া হয়।

—কে বন্ধ করে ?

—আজ্ঞে দিদিমণি নিজেই করতেন।

—আজও করেছিলেন ?

—তা বলতে পারব না।

—চাবি কোথায় ?

—দিদিমণির চাবির রিং-এ থাকে।

—রিংটা পাওয়া যাবে ?

—সে ত দিদিমণির কাছে।

কিন্তু চাবির রিং পাওয়া গেল না। পাপড়িদেবীর কোমরের গোঁজেও নেই। বাড়ির অন্য লোকও কেউ কিছু বলতে পারল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীল আবার প্রশ্ন করল—এই অ্যাকোয়ারিয়াম-এর গাছগুলো কতদিন আগে লাগানো হয়েছিল ?

আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ-হাওয়ায় প্রদীপের আলো যেমন কেঁপে ওঠে, ঠিক সেই রকম কেঁপে উঠে মালতি আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিল—ইয়ে, মানে—আমি তা কেমন করে জানব ?

হুঁ বলে নীল সেই যে চুপ করে গিয়েছিল, তার পর আর কাউকেই ও একটাও প্রশ্ন করে নি। সোয়া বারোটা নাগাদ সিংহীমশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এসেছিলাম। সারা রাস্তায় নীল প্রায় কোন কথাই বলে নি। কেবল নামার সময় বলেছিল—কেসটা খুব জটিল রে।

বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। আর শুয়ে থাকা যায় না। বেলাও বাড়ছে। পূব দিকের জানলা দিয়ে শীতের সকালের রোদ এসে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। মিঠে রোদ বেশ ভালোই লাগে। রেখাকে চায়ের কথা বলে রোদে পিঠ লাগিয়ে সকালের কাগজটা টেনে নিলাম। প্রথম পাতার নিচের দিকেই বোল্ড হেডলাইনে পাপড়ি লাহিড়ীর রহস্যময় মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হয়েছে। 'উত্তর কলকাতার সম্ভ্রান্ত লাহিড়ী পরিবারের একমাত্র কন্যা বিবাহের ঠিক পূর্বেই রহস্যজনক উপায়ে খুন হয়েছেন। খুনের প্রক্রিয়াও বেশ অভিনব। নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর এই খুনের তদন্তের ভার নিয়েছেন।' ইত্যাদি…।

কাগজটা রেখে দিলাম। এতক্ষণ ত পাপড়ির কথাই ভাবছিলাম। কাগজ আর কি নতুন সংবাদ জানাবে। সবই ত আমার জানা। মাঝে মাঝে ভাবতে বেশ লাগে। যে খবর আমি অনেক আগেই পেয়ে গেছি—সেই খবর এখন, এতক্ষণ পরে সারা কলকাতার লোক জানতে পারছে।

কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। রেখা এসে হাজির।

কাগজটা টেনে নিয়ে প্রায় সব রোদটাই একা দখল করে বসতে বসতে বলল,—দাদা, দেখেছো আজকের কাগজটা? খুব স্যাড্ না?

—হুঁ।

—হুঁ কিরে? কি বিশ্রী কাণ্ড বল ত! একবাড়ি লোক, একটু পরেই বিয়ে, মেয়েটার মনে কত আনন্দ, তার মধ্যেই মেরে ফেলল

মেয়েটাকে ! পৃথিবীতে এমন নৃশংস লোকও থাকে বাবা।

—আমি আগেই জানি।

—আগেই জানতে মানে ?

—কাল সারা সন্ধ্যে আমি আর নীল ওখানেই ছিলাম।

—আর তুই কিনা ফিরে এসে আমাকে বেমালুম মিথ্যে কথা বলে গেলি ?

—কি করি বল ? সত্যি বললে আবার তুই রেগে যাবি।

—তার মানে আজ কলেজ যাচ্ছিস না ?

—কি করে বুঝলি ?

—প্রথমতঃ এত ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিস্—

—সে তো তোর ঐ ভুবনবাবুর মোরগটার জন্যে। ব্যাটা সকালেই উঠে কানের কাছে এমন জোরে চিৎকার করে—আর দ্বিতীয়টা কি ?

—আজ তোর পক্ষে কলেজ করা অসম্ভব।

—ঠিক বলেছিস রেখা। রহস্য জিনিসটা বোধ হয় সংক্রামক ব্যাধির মত। একবার ছোঁয়ায় গেলেই পেয়ে বসবে। এক্ষুণি নীলের বাড়ি যেতে হবে। সে কিরে, উঠছিস কোথা ?

—মুখ-হাত ধুয়ে আয়, তোর খাবার করে দিই। দুপুরে খাবি ত —নাকি— ?

—ঠিক বলতে পারছি না। নীলের আজ কি প্রোগ্রাম জানি না।

রেখা উঠতে উঠতে পাকা গিন্নীর মত শুনিয়ে গেল—নীলদার পক্ষে যা মানায়, তোর পক্ষে তা মানায় না, মনে রাখিস। তোকে চাকরি করেই খেতে হবে।

আমার উত্তর না শুনেই গটগট করে বেরিয়ে গেল সে। বুঝলাম ও খুব রেগে গেছে। এইসব গোয়েন্দাগিরি ওর একদম পছন্দ না। নীলকেও অনেকবার বারণ করেছে। ওর ধারণা, এইসব ব্যাপারে

জড়িয়ে থাকলে একদিন না একদিন আমাদের কোন গুণ্ডা বদমায়েশের হাতে প্রাণ দিতে হবে। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ও সত্যিই আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

কি আর করা! ক্রাইম ডিটেকশান বা রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে আসল সত্যকে খুঁজে বের করার নেশা মদের নেশার চেয়েও বড় সাংঘাতিক। মাথায় ঢুকলে চট্ করে সরিয়ে ফেলা যায় না। আর সত্যকে খুঁজে পাবার নেশা মানুষের মধ্যে আছে বলেই না জগতে এত বড় বড় আবিষ্কার ঘটেছে, ঘটছে। ভয় পেয়ে বসে থাকলে কোনদিন চাঁদে যাওয়া যেত না। এভারেস্ট জয় করাও মানুষের পক্ষে কল্পনাই থেকে যেত। নীলের কথা বাদই দিলাম। ও তো এক নম্বর ডানপিটে ছেলে। কিন্তু আমি বরাবরই গোবেচারা ভালোমানুষ টাইপের। আমার প্রফেসানও সেই রকম। এক কলেজের বাংলার অধ্যাপক।

সত্যই ত, এসব কাজ আমার পক্ষে মানায় না, শোভাও পায় না। খুনীর পিছনে ছোটাছুটি করে তাকে ধরা, বা বন্দুক পিস্তল বাগিয়ে এলোপাথাড়ি চালানো কলেজের এক সামান্য প্রফেসরের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। তাছাড়া আমি অত্যন্ত সাধারণ লোক। আমাকে পেট চালানোর জন্যে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। যেটা নীলের পক্ষে স্পোর্টস আমার পক্ষে তা রীতিমত বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার। মাঝে মাঝে আমিও ভাবি কি দরকার এইসব উড়ো ঝামেলার মধ্যে থাকার। বেশ ত আছি, নির্ভেজাল বাঙালি হয়ে।

কিন্তু পারি না। নীল আমার একমাত্র প্রিয় বন্ধু। দীর্ঘদিন সুখে-দুঃখে ওর পাশে পাশে আছি। ওর মত বন্ধু পাওয়াও ভাগ্যের কথা। গোয়েন্দাগিরি কাজে ও যেভাবে আস্তে আস্তে ইন্‌ভল্‌ভ হয়ে পড়ল—ইচ্ছে থাকলেও আমি ওর সঙ্গ ছাড়তে পারলাম না। তারপর একে একে ও কেসগুলোকে সমাধান করে চলেছে। আমিও বেশ মনে মনে রোমাঞ্চিত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। এ এক বেশ

মজার খেলা। শক্ত একটা ধাঁধা সমাধান করতে পারলে যেমন একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, রহস্যের জটগুলো ধীরে ধীরে খুললে তেমনি এক মানসিক পরিতৃপ্তি আসে। এগুলো ঠিক বলে বা লিখে প্রকাশ করা যায় না। এটা উপলব্ধির ব্যাপার। তাছাড়া এতে আমার আরো একটা অন্য ধরনের আনন্দের মশলা তৈরি হচ্ছে। লেখা-টেখার সামান্য একটু নেশা আমার আছে। দু' একটা বই-টইও যে না হয়েছে তা না। নীল আর তার রহস্যগুলো নিয়ে কিছু লেখা যায়, এমন একটা চিন্তাও ইদানীং আমায় পেয়ে বসেছে। সুতরাং নীলের সঙ্গে থাকতে পারলে কোন বন্ধুকে সঙ্গদান ছাড়াও আমার নিজেরও কিছু লাভের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এসব কথা রেখাকে বলে বোঝানো যাবে না। ও ঠিক বুঝবে না। টিপিক্যাল বাঙালির মেয়ে। যে কোন বিপদে ভাই দাদা বা প্রিয়জনকে ছেড়ে দিতে এদের বড় অনীহা। এদের একটাই চরিত্র—আত্মীয়-পরিজনদের সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

আর বসে থাকা গেল না। উঠে পড়লাম। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে। এক্ষুণি নীলের বাড়ি যেতে হবে। নীল আমাকে টানছে।

চা জলখাবার খেয়ে যখন রাস্তায় পা দিলাম তখন ন'টার সাইরেন বাজছে। তাড়াতাড়ি চলেছি। দেখি সামনেই ভুবনবাবু চলেছেন হনহনিয়ে। একবার মনে হল ওঁকে ডেকে সেই প্রশ্নটা করি। হঠাৎ উনি একটা মোরগ কেন কিনে আনলেন? কিন্তু প্রশ্নটা করা গেল না। নিমেষে গলি পেরিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরে গেলেন উনি।

ঘরে ঢুকে দেখি নীল তখন বুলওয়ার্কার প্র্যাকটিস করছে। আমাকে দেখে একটু মুচকি হেসে ইশারায় বসতে বলল। প্রায় সাত

আট মিনিট পর একটা মোটা চাদর জড়িয়ে সামনের সোফায় এসে বসল।

আমার যেন আর তর সইছিল না। গতরাত থেকে মাথার মধ্যে কেবল পাপড়ি পাক খাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম—কাল ত আর একদম মুখ খুললি না। কি ভাবলি বল?

—বলছি। চা বলে এসেছিস?

এক গাল হেসে দীনু ঘরে ঢুকল—এ আর যেন নতুন করে বলা-বলির কি যেন আছে। সে তো যেন আমি জানিই। তোমরা যেন দুই বাবু এসে একসঙ্গে বসেছ, আর আমি চা নে আসবনি যেন।

'যেন'টা দীনুর মুদ্রাদোষ, ওর কথা থেকে 'যেন'টা বাদ দিলে বাক্যটা পুরো পাওয়া যায়। আমরা অভ্যস্ত। নতুন কেউ হলে দীনুর কথার মানে বোঝা মাঝে মাঝে শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

টেবিলের ওপর ডিম সেদ্ধ, কলা, টোস্ট আর চা রেখে চলে যাচ্ছিল। নীল খবরের কাগজটা উলটে-পালটে দেখছিল। দীনুকে চলে যেতে দেখে ও বলল—কিন্তু যেন সিগারেটটা যেন ঠিক সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় যেন।

ঘাড় নেড়ে দীনু বলল—সে আর বলতে হবে না যেন।

—মাঝে আর একবার চায়ের কথাটাও বলতে যেন হবে না তো?

—না না, আমার সব দিকেই খ্যাল আছে যেন।

—এবার তাহলে আপনি আসুন যেন।

দীনু চলে গেল।

ব্রেকফাস্টটা নীল প্রায় নিঃশব্দেই সারল। ইতিমধ্যে দীনু এসে এক প্যাকেট নতুন সিগারেট রেখে গিয়েছিল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ও একটা সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ আমি ওকে লক্ষ্য করছিলাম। নিঃশব্দে খেয়ে গেলেও আমি জানি, এখন ও অনেক কিছু ভাবছে। মনের মধ্যে এখন ওর ভাবনার পাহাড় ভেঙে

পড়েছে। জুত করে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধীরে ধীরে ও বলল—ভাবনার কথা বলছিলি, তাই না? তার আগে বল, তুই কি ভাবলি?

—আমি? দূর আমার ও সব ভাবনা-টাবনা তেমন আসে না। তবে আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না মেয়েটাকে কেন খুন করা হল?

—ওটা ত একটা ভাইটাল প্রশ্ন। আসলে কি জানিস, সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে আছে। একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। তুই কি বলিস?

—বেশ ত তুই বল।

নীল সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—শুধু তোর শুনলে হবে না। একটা কাগজ পেন্সিল নে। নোট কর। আর আমি যদি কোথাও কোন পয়েন্ট মিস্ করে যাই ধরিয়ে দিস। নে, প্রথমেই লেখ—

সোফায় পিঠটাকে টানটান মেলে দিয়ে গাছের গায়ে লেগে থাকা পাকা গমের মত রোদ্দুরের রঙ দেখতে দেখতে নীল যেন কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর খুব মৃদু স্বরে ও বলতে শুরু করল—উত্তর কলকাতার লাহিড়ী পরিবার বেশ বনেদী এবং সঙ্গতিসম্পন্ন। একটা নামকরা পরিবার। এক ডাকে অনেকেই এঁদের চেনে। ফ্যামিলিটা আজকের নয়। অনেক পুরনো। বাড়িতে ঢুকতেই ওদের বংশ তালিকাটা দেখেছিলি ত?

—হ্যাঁ, সে এক মস্ত ফিরিস্তি।

—মস্ত। তবে ইতিহাসের পাতায় এখন ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। বর্তমানটাই খুঁটিয়ে দেখা যাক। এই বংশের বর্তমান কর্তা রামতনু লাহিড়ী। বয়স আনুমানিক ষাট। কিন্তু দেখলে অতটা বোঝা যায় না। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান এবং সম্ভ্রান্ত চেহারার পুরুষ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর। তীক্ষ্ণ নাক, দৃঢ় চিবুক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। কাল আমরা তাঁকে কি ভাবে দেখেছি মনে আছে?

আমি বললাম—হ্যাঁ, মনে আছে। চেহারায় চরিত্রের কঠোরতা যাই থাক, মেয়ের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন।

—এবং বার দুয়েক বোধহয় মূর্ছা গিয়েছিলেন। এ দিয়ে কি প্রমাণ হয়?

—বাইরে থেকে যতটা শক্ত মনে হয়, ভেতরে ভেতরে উনি অতটা শক্ত নন!

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল—বেশ, ধরা গেল তাই। এক-মাত্র মেয়ের মৃত্যুতে নিশ্চয় মানুষ সংযম হারাতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু—

—থামলি কেন?

—এই টোটাল আপসেট, শুধু কি মেয়ের শোকে?

—তা ভিন্ন আর কি হতে পারে বল?

—আমার মনে হয়, এখানে খানিকটা সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারও রয়ে গেছে—

—অস্বাভাবিক কিছু না। সেটাও নিশ্চয় আর একটা পয়েণ্ট।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের মত তিনি শোকে এবং সামাজিক মর্যাদাহানির কারণে বেশ বিব্রত। অর্থাৎ রামতনু-বাবুর সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। আচ্ছা, এর পর চলে আয়—সেকেণ্ড ম্যান। অতনু লাহিড়ী। রামতনু লাহিড়ীর একমাত্র ভাই। বয়স আনুমানিক পঞ্চান্ন। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে কিন্তু রামতনুবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ বেঁটেখাটো এবং সাধারণ চেহারার মানুষ। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন পাকানো। সাধারণতঃ নেশাটেশা করলে এই ধরনের পাকানো চেহারা হয়। রংটা মাজা মাজা। এবং এটাও রামতনুবাবুর বিপরীত। যেমন আরো একটা বিপরীত ব্যাপার আছে। রামতনুবাবুর একমাথা কোঁকড়ানো চুল। অথচ অতনুবাবুর টাক পড়ো পড়ো। হয়ত খুব জোর আর বছর পাঁচেক। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। রামতনুবাবুর

পেশা কি মনে আছে ?

—না। আমি ঠিক খেয়াল করি নি।

—পৈতৃক ব্যবসা। তবে এটা আর এখন পৈতৃক বলা যায় না। কারণ সমস্ত ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক এখন রামতনুবাবু নিজে।

—কিন্তু ব্যবসাটা কি সেটা ত কাল ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

—তা হয় নি। কিন্তু আমি জেনেছি। এবং অনেকেই জানে। বড়বাজারে লোহালক্কড়ের দোকান আছে ওঁদের। উনি ওখানকার নামকরা হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট।

—কিন্তু পৈত্রিক ব্যবসা এখন নয় কেন বললি ?

—তার অন্তর্নিহিত কারণটা তোকে এখনই ডেফিনিট হয়ে বলতে পারব না, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসা যদি হত তাহলে অতনুবাবুর ত ঐ একই ব্যবসায় থাকা উচিত ছিল। কিন্তু অতনুবাবুর ব্যাপারটা যে অন্যরকম।

—অতনুবাবু কি করেন ?

নীল এবার আমায় একটু ধমকাল, তোর মনটা কোথায় থাকে রে হতভাগা ? সিম্পল লায়ন ত ম্যাক্সিমাম টাইম নিয়েছিলেন অতনুবাবুর বেলায়, মনে পড়ছে না ?

—না, আমি স্পষ্ট জবাব দিলাম, আমি ত কাল তোকেই লক্ষ্য করছিলাম।

নীল এবার হেসে উঠল, বলল—গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি ?

—না, তা নয়। আসলে বুদ্ধিমান গোয়েন্দার কাজগুলো নিখুঁত-ভাবে লক্ষ্য করলে অনেক কিছু জানা যায়। আর সিম্পল লায়ন ত অনেক বাজে প্রশ্ন করেন। মনে আছে তোর, আর কোন প্রশ্ন-ট্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ মালতিকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

নীল হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর সিম্পল লায়নের মত গলার স্বর গম্ভীর করে বলল—মরার পর মানুষ কোথায় যায় তা জানো ? এই ত ?

নীলকে থামিয়ে আমি বললাম—আচ্ছা, তুই বল, এ ধরনের প্রশ্নর কি মানে হয় ? প্রথমতঃ তুই গিয়েছিস একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে। তার সঙ্গে মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় তার কি সম্পর্ক আছে ? দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নটা করছিস কাকে ? না একজন প্রায় অশিক্ষিত বাড়ির কাজ করার লোককে। তা এগুলোকে ইডিয়টিক প্রশ্ন বলব না ত কি বলব বল ? এসব প্রশ্ন শোনার চেয়ে তোর কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করা অনেক কাজের।

আমার প্রশংসা বোধহয় নীলের ভালো লাগছিল না। তাই ও আগের কথায় ফিরে গেল—আটপৌরে ভাষায় অতনুবাবুর পেশাটা হচ্ছে দালালি।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—সে কিরে ? অত বড় বাড়ির ছেলে, দাদা নামকরা ব্যবসাদার আর তার ভাই দালাল ?

—তাও কোন একটা নির্দিষ্ট ব্যবসার না। যখন যা জুটে যায়।

—আশ্চর্য।

—খানিকটা। তবে এর পিছনেও নিশ্চয়ই কোন কারণ লুকিয়ে আছে।

—কি কারণ ?

—জানি না। আর সেটাই ত জানতে হবে।

—ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা কেমন ?

—কখনো জোয়ার, কখনো ভাঁটা !

—কিন্তু উনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন ?

—সেটা অবশ্য খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ ঐ পরিস্থিতিতে কতকগুলো বাইরের লোক এসে ওঁদের মৃত মেয়েটিকে পরীক্ষা করার নামে বেশ কিছুক্ষণ ওঁদের অন্য ঘরে আটক রাখবেন, সেটা ঠিক মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক।

—তা ওঁর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কিছু তোর নজরে এলো ?

—সেটা পরে। তবে ওঁর এই পেশার কারণটার একটা সন্তোষ-

জনক ব্যাখ্যা জানতে হবে।

—তিন নম্বর কে ?

—রামতনু লাহিড়ীর ছেলে সুতনু লাহিড়ী। বয়স প্রায় আটাশ-উনত্রিশ। রোগা ছিপছিপে চেহারা। চোখে চশমা। গায়ের রং বাবার মতই। সুশ্রী। কথাবার্তা সহজ, স্বাভাবিক। বোনের মৃত্যুতে যতটা দুঃখ পাওয়া উচিত ঠিক ততটাই উনি এলোমেলো। ভদ্রলোক চাটার্ড। ভালোই রোজগার করেন। বিয়ে করেছেন। সুন্দরী স্ত্রী। বছর চারেকের একটি ছেলে।

আমি বাধা দিলাম—একটা প্রশ্ন। আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে বছর চারেকের ছেলে ?

নীল বলল—আর্লি ম্যারেজ হতে পারে। অথবা বয়সটাও ত অনুমানের ওপর। হয়ত আমরা যা ভাবছি তা নয়। আর একটু বেশী। বত্রিশ-তেত্রিশ হতে পারে।

—বেশ। অস্বাভাবিক কিছু পেলি ?

—তেমন কিছু না। বরং, আগেই বলেছি, সবটাই স্বাভাবিক।

—এর পর কে ?

—এর পর আসা উচিত পাপড়ির। কিন্তু ও সব শেষে। এবার ধর শর্মিষ্ঠা। সুতনুর স্ত্রী। পাপড়িরই বয়েসী। সুন্দরী। শিক্ষিতা। একটু চাপা। চট্ করে ঘরের কথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলারও পক্ষপাতী নন। এগুলো সব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটু বুদ্ধিমতী রুচিশীলা এবং শিক্ষিতা মহিলা হলেই ঘরের কথা সাধারণতঃ বাইরের কারো কাছে প্রকাশ করতে চান না। বাচ্চাটাকে বাদ দিলাম। ও এখন পিকচারে নেই। নিকট আত্মীয় আর কে রইল ?

—পাপড়ির মামা, মেসো মাসী।

—ওরা ত সব অন্য বাড়ির। প্রয়োজনে ভাবা যাবে। বাড়িতে বাদ রইল কে ?

—মালতি।

—আসছি। তার আগে ধর মালবিকা দেবী মানে অতনু লাহিড়ীর স্ত্রী। অত্যন্ত খিটখিটে এবং বদমেজাজী। প্রত্যেকের সঙ্গেই ঝগড়া করার টেনডেন্সি।

ঠিক বলেছিস। সিম্পল লায়নের মত লোককেও বেশ নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন। উনি যখন প্রশ্ন করলেন—পাপড়ি দেবীর বিয়েটা কি আপনারা দেখেশুনেই দিচ্ছিলেন—ভদ্রমহিলা যেন খেঁকিয়ে উঠলেন—তবে কি আপনারা দেখেশুনে দেবেন?

—হুঁ। তবে এ দিয়ে ঠিক চরিত্রটা বোঝা যায় না। কিন্তু ওর এত রগচটা স্বভাব কেন? তাও জানার ব্যাপার। এবার আয় উদ্দালক মিত্তিরকে নিয়ে পড়ি।

—মানে পাপড়ির ভাবী বর।

—সে আর হল কোথায়? সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী যুবক। একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের এক্সিকিউটিভ। এ ছাড়াও আরো একটা কোয়ালিফিকেশন রয়েছে। ভালো গাইয়ে। গতকাল সন্ধ্যায় সে ছিল সম্পূর্ণ এলোমেলো এবং উদভ্রান্ত।

—যেটা আমার মতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

—অস্বাভাবিক আমিও বলছি না। কিন্তু এমন দুর্লভ জামাই বাংলা দেশের যে কোন মেয়ের বাবার কাছে কাম্য। তবুও এই বিয়ের ব্যাপারেই নাকি লাহিড়ী পরিবারে অশান্তি! কেন?

—জাতের অমিল হতে পারে কি?

—বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এসে সামান্য জাত-টাত নিয়ে? কে জানে, বনেদী ফ্যামিলির কি মর্জি? ঠিক আছে—সে পরে দেখা যাবে। বাকী রইল মালতি আর সুদাম। একজন ঝি আর একজন চাকর। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলাম। সে সকালে ডিউটি করতে আসে রাতে চলে যায়। সুদাম হাঁদা বোকা। বছর পঞ্চাশ বয়স। কানে কালা। আবার চোখেও কম দেখে। অবশ্য এতগুলো

গুণ একসঙ্গে থাকা একটু ভাববার কথা।

বাধা দিলাম—গুণ বলছিস কেন?

—গুণ না? একে হাঁদা বোকা, তার ওপর কানে কালা, চোখে কম দেখে। এমন আইডিয়াল চাকর চট্ করে পাওয়া যায় না। পুলিস ত কোন ছার। স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত পেট থেকে কথা বার করতে পারবেন না। মানিকজোড়ের অপরটি হল মালতি। এ যেন সেই হিন্দী সিনেমায় দেখা লাস্যময়ী কোন নটীকে ঝিয়ের রোলে অভিনয় করতে নামানো হয়েছে। সর্বাঙ্গে কোথাও ঝিয়ের লেশমাত্র নেই। একটু সেজে-টেজে নিউ মার্কেটে ঘুরলে তুই কিছুতেই বুঝতে পারবি না মেয়েটা অরজিনালি কি? বয়স ধর চব্বিশ-পঁচিশ। চেহারায় উগ্র দৈহিক কামনার আবেদন। চোখে পুরুষ-হৃদয় তোলপাড় করা চাহনি। কথাবার্তায় একটু চটুল। আর পুরুষকে অবজ্ঞা করার মনোভাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পুরুষদের আমি বেশ ভালো চিনি এরকম একটা ভাব, তাই না?

—ঠিক বলেছিস।

—তবে মেয়েটা যে ঝিয়ের কাজ করে সেটা ওর অত উগ্র যৌবন থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় ওর হাতের আঙুলগুলো দেখলে। নেল পালিশ লাগানো সত্ত্বেও বোঝা যায় আঙুলের নখ বেশ খওয়া-খওয়া। আর হাতের চেটো বেশ রুক্ষ।

একটু অবাক হয়েই বললাম—দূর থেকে তুই এত বুঝতে পারলি?

—ঠিক না-ও হতে পারে। এটা আমার অনুমান। তবে মেয়েটা খুব ফেলে দেবার মত বা উড়িয়ে দেবার মত না। মনে হচ্ছে ও অনেক কিছু জানে। ওর চোখে অনেক গোপনতার ছায়া দেখতে পেলাম।

—তার মানে, বলছিস রহস্যের চাবিকাঠি ওখানেই আছে?

—দূর পাগল, এত তাড়াতাড়ি কি কিছু বলা যায়? জলটা

খুব ঘোলাটে আর গভীর। কোথায় যে কি লুকিয়ে আছে, খালি চোখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এবার আয় পাপড়ি লাহিড়ীর পরিচয়ে। বাংলা দেশের একটা মিষ্টি মেয়ে। যে মেয়েকে দেখলে যে কোন সহজ পুরুষ ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। ব্যবহারে মেয়েটা কেমন ছিল তা জানি না, কিন্তু চেহারাটা ঐ রকমই। উদ্দালকের মত একটা সুন্দর ছেলেকে ও ভালোবেসেছিল। বাড়ির অমত সত্ত্বেও পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা করেই সে বিয়ে করতে যাচ্ছিল তার ভালোবাসার মানুষকে। কিন্তু বিধাতার অন্য ইচ্ছায় তার সব প্রতিরোধ ভেঙে গেল। মৃত্যু এসে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

মেয়েটা জেদী। নিজের প্রতিজ্ঞায় একনিষ্ঠ। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা রাখে। ভালোবাসাকে মর্যাদা দেবার জন্যে সে সামাজিক সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে মাথা নত করতে চায় নি। বাংলায় এম. এ. পড়ছিল অথবা পাস করেছিল। গান গাইত। বোধ হয় উচ্চাঙ্গ।

—বুঝলি কেমন করে?

—পাপড়ির অ্যালবামের পাতা ওল্টালেই বুঝবি। কনভোকেশান গাউন পরা সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয় বি. এ. পাস করেছিল। আর ওর বইয়ের তাকে কিছু এম. এ. ক্লাসের বাংলা পাঠ্যপুস্তক শোভা পাচ্ছিল। আর গান? ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকের কোণের তানপুরা তবলা নিশ্চয় বলে দেবে মেয়েটি গানের অনুরক্তা।

—কিন্তু গান যে করেই ডেফিনিট হয়ে কি করে বলছিস? অন্য কেউ যদি—

—নাঃ। অন্য কেউ গান করলে তার তানপুরা নিজের ঘরে, মানে অত সাজানো গোছানো ফিটফাট ঘরে পাপড়ি রেখে দেবে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে সেটা সম্ভব হতে পারে। জায়গার অভাবে এক ঘরেই হয়ত সবকিছু ঢুকেছে। হারমোনিয়ামের পাশেই

হয়ত দেখবি ক্রিকেট ব্যাট রয়েছে। কি বক্সিং গ্লাভস রয়েছে। পরিবারে দু' ভাই থাকলে তোর পক্ষে বলা অসুবিধার হত কে গান করে আর কে ক্রিকেট খেলে। কিন্তু পাপড়ির অবস্থা অন্য রকম। অত বড় বাড়ি। ঘরের অভাব নেই। তার ওপর পাপড়ির নিজস্ব একটা ঘর রয়েছে। অন্য কারো তানপুরা নিজের ঘরে সে নিশ্চয় রাখবে না। গান ছাড়াও পাপড়ির শখ রঙীন মাছের।

মাছের কথা আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে নীলের অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকার দৃশ্যটা। তাই বেশ আগ্রহ নিয়েই প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা নীল—মোটামুটি তুই লাহিড়ী বাড়ির চরিত্রগুলোর একটা স্কেচ তৈরী করলি। কিন্তু তিনটে প্রশ্ন এখনও আমার ক্লীয়ার হচ্ছে না। একটু ব্যাখ্যা কর।

—বল্।

—এক নম্বর, ঘরে ঢুকেই তোর মুখে প্রথম একটা কথা শুনেছিলাম। তুই বলেছিলি 'আশ্চর্য'। কেন? এবং কি দেখে তুই ঐ শব্দটা উচ্চারণ করেছিলি?

মুচকি মুচকি হাসছিল নীল। সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে ও বলল—প্রশ্নটা ভালো। এবং বুদ্ধিমানের মত। বলতে পারিস অজু, একটা সাজানো ঘর, কোথাও কোন এলোমেলো ব্যাপার-স্যাপার নেই। সব কিছুতেই একটা পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ। এমন কি ঐ রকম ঘরে ম্যাচিং করিয়ে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে স্পেশাল সাইজের অ্যাকোয়ারিয়াম যে মেয়ে বসাতে পারে, নিশ্চয় সে প্রতিদিনই সেই অ্যাকোয়ারিয়াম যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করবে? বিশেষ করে বিয়ের দিনে আরো বেশী সাজানো থাকবে—তুই কি বলিস?

—নিশ্চয়ই। তাই ত হওয়া উচিত। অবশ্য ফুল-টুল দিয়ে ঘরটা বেশ গোছানো এবং সাজানোই ছিল।

—ছিল। কিন্তু খুবই মামুলী হলেও একটা জিনিস আমার অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। যত্নে লাগানো মাছের চৌবাচ্চায় সার দিয়ে সাজানো রয়েছে অ্যামাজন গাছের সারি। মাছের শখ যাদের আছে, তারাই জানে অ্যামাজন গাছটা বেশ দামী। অমন দামী গাছ কেউ অযত্নে রাখে ?

—না।

—কিন্তু আমি গিয়েই দেখি, পাশাপাশি লাগানো তিনটে গাছ শিকড় সমেত উপড়ানো হয়ে জলের ওপর ভাসছে। এটা কি হওয়া উচিত ? বিশেষ, যে বাড়িতে সেদিন উৎসবের আয়োজন। যে ঘর ফুলে ফুলে টিপটপ করে সাজানো হয়েছে ? এটা আশ্চর্যের নয় ?

মাথা নেড়ে জানালাম নীল ঠিকই বলেছে। তারপর বললাম—আমার দু' নম্বর প্রশ্ন, তুই কি ঐ জন্যেই অ্যাকোয়ারিয়ামটার ধারে অতক্ষণ ঘুরঘুর করছিলি ?

—খনিকটা ত বটেই। যে কোন ব্যাপারেই আমি ডেফিনিট হতে চাই। আর সামান্য একটা কৌতূহল মেটাতে গিয়ে আমি দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছি।

—কি ?

—কাচের চৌবাচ্চার নিচে যে বালির আস্তরণ থাকে সেখানে বেশ পুরু হয়ে শ্যাওলা জমেছে। অ্যাকোয়ারিয়ামে শ্যাওলা জমানোর জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এখানেও তাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাপড়িদেবী বেশ যত্ন নিয়েই বিশেষ কায়দাকানুন মেনে কাচের চৌবাচ্চায় পুরু শ্যাওলা জমিয়ে শোভা বর্ধন করিয়েছেন। কাছে গেলে, ভালোভাবে নজর দিয়ে পরীক্ষা করলেই তুই দেখতে পেতিস, একটা বিশেষ জায়গায় বালির চাপড়া শ্যাওলা সমেত সরে গেছে। অর্থাৎ কেউ ওখানকার বালি সরিয়ে কিছু করেছিল। তারপর নিজের কাজ মেটার পর আবার সেই চাপড়াটা পূর্বস্থানে বসিয়ে দিয়েছে। কাজটা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি

করা হয়েছিল, যার জন্য বালির সরানো অংশটা ঠিক মত বসানো যায় নি। এবং সেই তাড়াহুড়োর জন্যেই গাছের সার থেকে তিনটে গাছ শিকড় সমেত উপড়ে জলে ভাসছিল।

—এ দিয়ে তুই কি বোঝাতে চাইছিস ?

—কিছুই বুঝি নি। বোঝাতেও চাইছি না। কেবল যা ঘটনা, আমার অনুমানে যা ঘটেছে বা ঘটে থাকতে পারে তাই-ই বললাম। এবার তোর তিন নম্বর প্রশ্ন কর।

—সিম্পল লায়ন যখন এদের জেরা করছিল তখন তুই প্রায় মিনিট দশেকের জন্যে বাথরুমে, আই মীন যেখানে পাপড়ির দেহটা পড়ে ছিল, সেখানে কি করছিলি ?

নীল একদৃষ্টে প্রায় সেকেণ্ড দুয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—ঘড়ি দেখেছিলি ? প্রায় দশ মিনিট, তাই না ? দশ মিনিট সময়টা খুব বেশী না। কিন্তু তার মধ্যেই ক'টা ইমপর্ট্যাণ্ট ব্যাপার আমার মগজে ঢুকেছিল। বাথরুমের ওপাশে সুইপার ঢোকার দরজাটা খোলা ছিল, আগেই দেখেছিলি। তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, বাথরুমের দরজাটা খোলা থাকবে কেন ? ওটা ত খোলা থাকার কথা নয়। তবু খোলা। কেন ? তার ওপর মালতি বলল, দরজাটা কখনোই খোলা থাকে না। সেকেণ্ড টাইম বাধ্য হয়েই আবার গেলাম। কি আছে দরজার ওপাশে তাই দেখতে।

—গিয়ে কি দেখলি ?

—বলছি। দরজাটা খুলে দেখলাম একটা স্পাইরাল স্টেয়ারস সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এই ধরনের সিঁড়ি আজকাল কমই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এটা পুরনো কালের বাড়ি, সেই রীতি অনুসারে স্পাইরাল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে একটা সুবিধে হয়। খুব অল্প জায়গার মধ্যে সিঁড়ির কাজটা মিটিয়ে ফেলা যায়। বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওটা বাড়ির পিছন দিক। লোকজন প্রায় যাতায়াত করেই না। টর্চটা জ্বালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে

এলাম। একটা বাগানের মত। কিন্তু বাগান না। খানিকটা পড়ে থাকা জমিতে আগাছার জঙ্গল। দু' একটা ডুমুরের গাছ। কয়েকটা টগরের ঝাড়। দেখলেই বোঝা যায় জায়গাটা অব্যবহৃত, অপরিষ্কৃত। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে একটা চলার পথ সোজা চলে গেছে সীমানা পর্যন্ত। যেখানে পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট খিড়কির দরজাটা রয়েছে। বোঝা গেল এই পথ দিয়েই মেথর যাতায়াত করে। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না। তার ওপর এখন শীতকাল। কোথাও কোন পায়ের ছাপ-টাপ দেখতে পেলাম না। ওঠার পথে একতলা আর দোতলার বাথরুমের দরজাগুলোও ধাক্কা দিয়ে দেখলাম। ভেতর থেকে বন্ধ।

—তাহলে বলছিস পরিশ্রমই সার হল। কাজের কাজ কিছুই হল না।

—উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু অবশ্য পাই নি। তবুও একেবারে যে বৃথা পরিশ্রম তাও বলছি না। হত্যাকারী খুব চালাক। কোন বিশেষ কিছুই সে নিজের অজান্তে ফেলে যায় নি। কিন্তু ক্রাইমের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমি সর্বদাই মানি। কিছু না কিছু সূত্র অপরাধী ফেলে যাবেই। যেতে বাধ্য। অপরাধের সময় অপরাধীর নার্ভের অবস্থা যে রকম থাকে তাতে করে খুব সজাগ লোকও কোন না কোন সামান্যতম নিদর্শনও ফেলে রেখে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সূত্র হিসেবে সে কোথাও পায়ের ছাপ রেখে যায় নি, একটা রুমাল পর্যন্ত অসাবধানে তার হাত ছাড়া হয় নি। কিন্তু যে জিনিসটা সে ফেলে রেখে গেছে সেটা অত্যন্ত কমন একটা নিদর্শন। কলকাতা শহরে কয়েক লাখ লোক সেই জিনিসটা ব্যবহার করে। তবুও সেটা আমার কাছে একটা সূত্র।

—কি ? কি সেটা ? আমি বেশ উৎসাহ নিয়েই জিজ্ঞাসা করি।

নীল চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। ওর বইয়ের আলমারীর একটা বই সরিয়ে তার পেছন থেকে একটা রুমাল বার করে নিয়ে এলো।

রুমালটা টেবিলের ওপর খুলে দিতেই দেখলাম একটা অর্ডিনারী সিগারেটের প্যাকেট। আর তিনটে পোড়া সিগারেট। সিগারেটের প্যাকেটটাও কমন। রয়েল সাইজ ফিল্টার উইলস্-এর। আধ-পোড়া সিগারেটগুলোও ঐ উইলস্-এরই। আমার মগজে তেমন কিছু ঢুকল না। সূত্র বা হত্যাকারীর নিদর্শন হিসেবে নিতান্তই নগণ্য। জানি না, নীল এর মধ্যেই কি এমন উল্লেখযোগ্য সূত্র পেয়েছে। তাই বললাম,—কিন্তু কলকাতা শহরে ত—

আমার কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল—বেশ কয়েক হাজার লোক এই সিগারেট খায়—তাই ত ?

—নিশ্চয়ই।

—তা হোক ! এই ক'টা পোড়া সিগারেট আর এই খালি প্যাকেট থেকে দুটো সূত্র বেরিয়ে আসছে। দুটো জিনিসই পড়ে ছিল মাথা-ঝাঁকড়া ডুমুর গাছটার নিচে। জায়গাটা দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার থাকে। ইচ্ছে করলে যে কোন লোক ঐ গাছের নিচে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। অর্থাৎ এটাই মনে করা যেতে পারে যে হত্যাকারী নিশ্চয় বেশ কিছুক্ষণ ঐ গাছটার নিচে লুকিয়ে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ অর্থাৎ অন্ততপক্ষে মিনিট পঁয়তাল্লিশ গাছটার নিচে সে অপেক্ষা করেছিল। কেননা তাকে তিনটে সিগারেট শেষ করতে হয়েছিল। তিনটে সিগারেট শেষ করতে বোধহয় ঐ রকম সময়ই লাগে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য কর, দুটো সিগারেট প্রায় যেখানটায় নামটা লেখা আছে অতদূর পর্যন্ত পোড়া। কিন্তু একটা সিগারেট অর্ধেকও শেষ হয় নি। তার মানে কিছু বুঝলি ?

—খানিকটা। দুটো সিগারেট পুরো সময় নিয়েই খেয়েছে। কিন্তু শেষ সিগারেটটা শেষ হবার আগেই তার অপেক্ষা করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

—কারেক্ট। এবার দেখ এই প্যাকেটটা। খোল। কিছু বুঝতে পারছিস ?

প্যাকেটটা খুলে দেখলাম সেটা সম্পূর্ণ খালি। এছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ল না। নীল নিজেই ব্যাখ্যা করে দিল। সাধারণতঃ আমরা সিগারেটের প্যাকেট খুলে প্রথমেই কাটা রাংতাটা ফেলে দিই। কিন্তু কিছু কিছু লোকের স্বভাব দেখবি, তারা রাংতার ঐ কাটা অংশটা ফেলে দেয় না। প্যাকেটটা খুলে রাংতাটা সরিয়ে সিগারেটটা বার করে আবার রাংতাটা চেপে রেখে দেয়। তাদের ধারণা, এতে সিগারেটের ফ্লেভারটা ঠিক থাকে আর ড্যাম্প ধরে না। পাপড়ির হত্যাকারীও সেই দলের। তার স্বভাব রাংতাটা রেখে দেওয়া। যেটা এখানে এখনও আছে।

বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু কলকাতা শহরে এই হ্যাবিট বহু লোকের পাবি।

উত্তরে নীল বলল—পাপড়িকে হত্যা করেছে কলকাতার বহু লোক নয়। একজন। এবং সেই একজন পাপড়িদের অতি পরিচিত। এমন পরিচিত যে সে বাড়ির সব কিছু জানে, চেনে। এবং সেই বিশেষ একজন এও জানত, কোন লোক কোন কারণে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ফেললেও এটা সেটা বলে সে ম্যানেজ করতে পারবে। তার ওখানে যাবার এক্তিয়ার আছে, এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ লোকটাকে লাহিড়ী বাড়ির সবাই চেনে।

খুব একটা অযৌক্তিক মনে হল না নীলের কথাটা। ওর কথা মেনে নিয়ে বললাম—তারপর ?

—তারপর ওগুলো কালেক্ট করে ওপরে চলে এলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম না। ঐ সিঁড়ি বেয়েই সোজা ছাদে চলে গেলাম। কারণ সিঁড়িটা ছাদ পর্যন্ত চলে গেছে। ছাদে গিয়ে দেখলাম, সেখানে ম্যারাপ বাঁধা। কিন্তু লোকজন একদম নেই। অর্থাৎ এই দুর্ঘটনার জন্যে ছাদে যাবার আর কারো প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত বলছি, হত্যাকারী হত্যা করার পর নিচে নামে নি। সে ছাদে উঠে বাড়ির মধ্যে নেমে গেছে।

—এত ডেফিনিট হলি কেমন করে ?

—নিচে নেমে গেলে তাকে বাড়ির বাইরে যেতে হত খিড়কি দরজা দিয়ে। কিন্তু খিড়কির দরজা বন্ধ। আর বাগানের উঁচু পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে যাবার কথা ভাবছি না। কারণ সেটা খুবই রিস্কি ব্যাপার হয়ে যেত। ধরা পড়লে চেনা লোককেও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে অসুবিধায় পড়তে হতো। তোর প্রশ্নগুলো সব শেষ হয়েছে ত ?

—একটা বাকী। হাসবি না ত ?

—না। বল্।

—পাপড়ির ঘরে যাবার জন্যে যখন আমরা তেতলার সিঁড়ির কাছে পৌঁছেছি, তখন, জানি না তোর কানে গেছে কিনা, একটি মহিলাকণ্ঠের চাপা কান্নার আওয়াজ—

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল বলল—সাবাস। ভেবেছিলাম এটা তোর কান এড়িয়ে গেছে। আমার মনে আছে। কিন্তু কে ? তা জানি না। কেই বা অমন করে কাঁদতে পারে ? মালতি ? না। কারণ মালতিকে আমরা যখন দেখলাম তখন বিন্দুবিসর্গ কান্নার চিহ্ন তার চোখে মুখে ছিল না। তবে কে ? মালবিকা দেবী ? উঁহু! শর্মিষ্ঠা দেবী ? হতে পারে না। ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি ওঁর বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব এরা কেউ না। তাহলে—

—কোন আত্মীয়-স্বজন হতে পারে কি ?

—বিয়ে-বাড়ি। কে যে কোথায় লুকিয়ে কাঁদছে, কি করে বলা যাবে ? তবে যিনিই কাঁদুন না কেন, পাপড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর। হয়ত পাপড়ির মৃত্যু তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে। বাট হু ওয়াজ দ্যাট লেডী ? তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। কারণ গতকাল তাঁকে আনা হয় নি। মনে হয় ইচ্ছে করেই। কিন্তু কেন ? আসলে কি জানিস, কেসটা ঘোলাটে আর জট পাকানো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—তুই সিওর যে এটা মার্ডার ?

—সেণ্ট পার্সেণ্ট। এবং কুল ব্রেনে অনেকদিন ধরে হিসেব করেই মার্ডার করা হয়েছে। আরো একটা কথা, হত্যাকারী তোর আমার মত খুব সাধারণ না। লোকটা হয় একজন ডাক্তার অথবা ডাক্তারী শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান। অবশ্য কম্পাউণ্ডারও হতে পারে। কারণ সে জানে কেমন করে ইণ্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দেওয়া হয়।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললাম—তা ত বটেই। তা ত বটেই! তাহলে কনক্লুসানটা কি দাঁড়ালো? প্রি-প্লানড অ্যাণ্ড প্রিমেডিটেটেড একটা মার্ডার। দেখেশুনে হিসেব করে বিয়ের দিনটাই বেছে নিয়েছে। হত্যাকারীও বাড়ির পরিচিত। কিন্তু মোটিভ?

নীল আমার কথাটা উড়িয়েই দিল—পরে, পরে। সে পরে ভাবব। আগে ত পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আসুক। ঠিক কি ধরনের বিষ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, সেটা দেখা যাক। তার ওপরও অনেক নির্ভর করছে। হত্যার প্রসেস জানতে পারলে হত্যাকারীর চরিত্রটাও বোঝা যায়। রিপোর্টটা না পেলে এগুলো যাবে না আপাততঃ। তবে একটা কথা, গাঁয়ে মানে আপনি মোড়লের মত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

—কেন?

—সরল সিংহ নিজের স্বার্থে কাল আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে কি উচিত হবে, দুম করে কেসটার মধ্যে মাথা গলিয়ে দেওয়া?

—তাহলে এত সব ভাবলি কেন?

—ভেবে রাখতে দোষ কি? কাউকে না কাউকে ত ভাবতে হবেই।

—তোকে ডাকবেই।

—বলছিস?

—সরল সিংহের পক্ষে এ কেস সল্‌ভ করা নেক্‌স্ট টু ইমপসিবল।

—এনি ওয়ে। ওপরওলা থেকে খবর-টবর না দিলে আমি আর

সময় নষ্ট করছি না।

এবার আমি ছোট্ট একটা রসিকতা করতে ছাড়লাম না—কিন্তু ব্যাঙ বাদুড়ের একটা কিছু ত গিলতে হবেই—

—তা বলে একেবারে হ্যাংলার মত না।

হ্যাংলামী করতে হল না। সন্ধ্যে নাগাদ এসে হাজির হলেন সত্যেনদা। পুলিস অফিসার সত্যেন মুখার্জী। হাতে ওপরওয়ালার স্পেশাল আমন্ত্রণপত্র। কাগজটা খুলে নীল পড়ল। তারপর আমার হাতে দিয়ে বলল—নে, পড়ে দেখ। একে বলে খাতির।

নীলকে কিছু না বলে লেখাটা পড়লাম। বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, নীলাঞ্জন ব্যানার্জীর পূর্ববর্তী অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতি লক্ষ্য করে কমিশনার সাহেব অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। বর্তমান পাপড়ি হত্যা রহস্যের ক্ষেত্রে শ্রীব্যানার্জী প্রথম দিনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির উপর আস্থা রেখেই তিনি শ্রীব্যানার্জীকে এই হত্যা রহস্যের সমাধানে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছেন। শ্রীব্যানার্জী তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে এই রহস্যের সমাধান করলে পুলিস কর্তৃপক্ষ তাকে সর্ববিষয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন। শ্রীব্যানার্জীর সাফল্য কামনা করে দস্তখত করেছেন স্বয়ং পুলিস কমিশনার।

পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলাম। পাইপ টানতে টানতে সত্যেনদা বললেন—কি নীলবাবু, এবার খুশি ত?

—সত্যেনদা, এটা বোধহয় ঠিক খুশি অখুশির ব্যাপার নয়। আসলে এই ইনভিটেশানটা বোধ হয় আমার পক্ষে সম্মানের। তাই না?

—নিশ্চয়। মাথা নেড়ে সত্যেনদা বললেন।

—তাছাড়া নীল আগের কথার জের টেনে বলল—উপযাচকের মত কেসটার মধ্যে মাথা গলালে সম্মান থাকে না। আর আপনি

নিশ্চয়ই জানেন, আমি টাকাপয়সা চাই না। চাই সম্মান। সেটা হারাতে কোন মতেই রাজী নই।

—সেই জন্যেই তুমি যখন আমাকে সবকিছু জানালে, আমি সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তোমার কথা বললাম। উনি ত তোমাকে ভালো করেই চেনেন। খুব আনন্দের সঙ্গেই উনি এই চিঠিতে সই করে দিলেন। এবার তোমার খুশিমত এগিয়ে যাও।

হঠাৎ আমি বললাম—আচ্ছা, বেবী এলিফ্যান্ট আবার ক্ষেপে যাবে না ত?

সত্যেনদা হেসে ফেললেন—বেবী এলিফ্যান্ট মানে সরল সিংহ? তা একটু কি আর জেলাস হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তবে অন্য কেউ হলে ক্ষেপে যেতেন। নীলের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। নীলকে ত উনি নিজেই ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে আর রাগার কি থাকতে পারে? তাছাড়া অ্যাকচুয়ালি কেসটা ত সরল সিংহের এলাকারই। দায়িত্ব ত ওঁরও রয়েছে। না না, ও নিয়ে কিছু ভাবার নেই। গো অ্যাহেড, নীল। আর কেউ না থাক আমি ত আছিই তোমার সঙ্গে।

নীল হেসে জবাব দিল—সে আমি জানি সত্যেনদা। তাই ত গোয়েন্দাগিরিতে গোড়ার দিকে তেমন ইচ্ছে না থাকলেও এখন আস্তে আস্তে কেমন ইনভলভ্‌ড্‌ হয়ে যাচ্ছি।

—তাহলে এখন বল, তুমি কি কি ভেবেছ বা ভাবছ?

একটুখানি চুপ করে থেকে নীল কি যেন ভাবল। তারপর সকালে নীল আমাকে যে যে কথাগুলো বলেছিল তাই আগাগোড়া এক এক করে সব খুলে বলল। কেবলমাত্র সিংহীমশাই-এর বোকামীগুলো বাদ দিয়ে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সত্যেনদা সব শুনলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—এখন তাহলে তোমার সামনে তিনটে প্রবলেমের আশু মীমাংসা হওয়া দরকার। এক নম্বর, কাল রাত্রে ও বাড়িতে কোন্ মহিলার কান্না তুমি শুনেছিলে? দু’

নম্বর, অ্যাকোয়ারিয়ামটা কেন এলোমেলো হয়ে ছিল? তিন নম্বর, পাপড়িদেবীর চাবির রিং কোথায় গেল? চাবি হারালে উনি গয়নাগাটি পরলেন কেমন করে?

মাথা নেড়ে নীল সম্মতি জানিয়ে বলল—সব থেকে আগে আমার পাওয়া দরকার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। ভিসেরা রিডিং না পাওয়া গেলে হত্যাকারীর নেচারটা বোঝা যাচ্ছে না।

নীল একটু যেন অধৈর্য হয়ে পড়ল।

—কিন্তু রিপোর্টটা পেতে কি খুব দেরী হবে?

সত্যেনদা একটু হেসে হেসে বললেন—যা তোমাদের লোডশেডিং-এর ধুম। অন্ধকারে কি ঠিকমত ঠিক সময়ে রিপোর্ট পাওয়া যায়? তবে আমার মনে হচ্ছে কালকের মধ্যেই রিপোর্ট পেয়ে যাবে

—লাহিড়ী বাড়ির খবর কি?

—জানি না। সিংহীমশাই হয় ত খবর রাখছেন।

—ওদের দিক থেকে কিছু তাড়ার ব্যাপার শুনলেন?

—তেমন কিছু আমি শুনি নি। তবে তোমার চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়।

এবার আমিই উত্তরটা দিলাম,—না সত্যেনদা, নীল কিন্তু একদম বসে নেই। হয়ত শারীরিকভাবে বসে আছে কিন্তু মনে মনে, আমি জানি, পাপড়ি লাহিড়ী ছাড়া ওর মাথায় অন্য কিছু নেই।

হঠাৎ সত্যেনদা হাতঘড়িটা দেখেই উঠে পড়লেন—আজ চলি নীল। আমারও হাতে অনেকগুলো ঝামেলার কেস ঝুলছে। পরে একদিন বলব।

—মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না, যাবার সময় দেখা করে যাব। চলি। উইস ইউ বেস্ট অব লাক। মাঝে মাঝে দেখা কোরো।

—সে আর বলতে।

সত্যেনদা চলে গেলেন। নীলও ধীরে ধীরে সোফার পুর

গদিটার মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে ডুবে গেল। ওকে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম আজ আর ওর সঙ্গে এসব নিয়ে কোন আলাচনা করে সুবিধে হবে না। হাজার ডাকাডাকি করলেও ও এখন হুঁ-হাঁর বেশী কিছুই উত্তর দেবে না। মিনিট পাঁচেক আমি চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়লাম। শীতের রাত। যেতেও হবে অনেকটা। 'আমি চলি রে' বলে বেরিয়ে পড়লাম।

* * *

ঠিক তিন দিন পর রবিবার সকালে নীল এলো আমার বাড়িতে। যথারীতি ভুবনবাবুর মোরগের ডাক শুনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল সেদিনও। দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে ভাবছিলাম নীলের বাড়িতেই যাব। ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়ি নি। তাহলে দেখা হত না।

খুব গম্ভীর মুখ নিয়ে নীল এসে বলল—চল, একটু বেরুতে হবে।

—তা না হয় বেরুচ্ছি, কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলি?

তেমনি গম্ভীর হয়েই ও মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, পেয়েছি। বড় সাংঘাতিক রে!

—একটু ক্লীয়ার করে বল। নইলে বুঝব কেমন করে?

—মার্ডারটা যে খুব সাদামাটা নয় তা আমি প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম। হত্যাকারী নিঃশব্দে কাজ সারতে চেয়েছিল। আর তাতে কৃতকার্যও হয়েছে। বন্দুক পিস্তল বা ছোরাছুরির ধারে কাছে না গিয়ে বড় অদ্ভুত উপায়ে খুনটা করেছে। এমন ভাবে হত্যা করা হয়েছে যা সাধারণ পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধরা পড়বে না। আমি ভাবতে পারি নি এভাবে মার্ডার হয়েছে।

ধৈর্য হারাচ্ছিলাম। বললাম—তাড়াতাড়ি বল।

মৃদু হেসে ও বলল—প্রথম রিপোর্টটা পেয়ে ত তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। স্টমাকে কোন পয়জন নেই। ভেন নরমাল। বড় আশ্চর্য লাগছিল। তাহলে মৃত্যুটা হল কি ভাবে? পাপড়ি কি তাহলে ভয় পেয়ে মারা গেল। তাই যদি যাবে তাহলে হাতে নিড্‌ল্‌

প্রিকিং-এর দাগ কেন ? পাপড়িকে ক্লোরোফর্ম করার দরকারই বা কেন হয়েছিল ? নিজে গিয়ে তক্ষুণি ফোরেনসিক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। সত্যিই যদি ও ভয় পেয়ে মারা গিয়ে থাকে, তাহলে ত মৃত্যুকালীন নার্ভাস সিস্টেম নরম্যাল হবে না। সেটা পোস্টমর্টেম-এ ধরা পড়বে। খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সব রিপোর্ট যদি নরম্যাল থাকে তাহলে মৃত্যুটা হল কি ভাবে ? কোন না কোন ভাবেই হার্টের গতি থেমে গেছে। সেটা আর কি হতে পারে ? আর এটা খুঁজে না বার করতে পারলে কোন মতেই প্রমাণ করা যাবে না যে এটা একটা হত্যা ! অথচ আমার মন বলছে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কোন অ্যাবনরম্যাল উপায়েই পাপড়ির হার্টের কাজ বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব খুলে বললাম ডাক্তারকে। এও বললাম—স্বাভাবিক মৃত্যুই যদি হবে তাহলে নাকে ক্লোরোফর্মের চিহ্নই বা কেন এবং ভেনে কিছু ইনজেক্ট করার দরকারই বা কি ?

আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ ডাক্তার বলে উঠেছিলেন—বাই জোভ ! দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান পসিব্‌ল্ চান্স।

আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে উনি ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

নীল থামল। একটা সিগারেট ধরাল। বেশ আগ্রহ সহকারে দীর্ঘমেয়াদী একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে নাক-মুখ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

রেগে গিয়ে বললাম—গাঁজারুর মত মৌজ করে ধোঁয়া ছাড়বি, না আসল কথাটা বলবি ?

—তোকে আমি আগেই বলেছিলাম হত্যাকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কেবল বুদ্ধিমান না, ডাক্তারী শাস্ত্রে তার জ্ঞান আছে যথেষ্ট। যে হত্যা করেছে সে হয় ডাক্তার, না হয় কম্পাউণ্ডার। কিভাবে খুন করেছে জানিস, এম্‌টি সিরিঞ্জ ভেনে পুস করে কয়েকটা বাব্‌ল্ চালান

করে দিয়েছে। আর সেটা সটান গিয়ে হার্টের রেসপিরেশানের দরজাটাকে করে দিয়েছে ব্লক্‌ড্‌। আর তার অবধারিত ফল মৃত্যু। সাধারণতঃ এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যেই এইভাবে একজনের মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে।

হাঁ করে বোকার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—বলিস্ কিরে ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সাধারণ পোস্টমর্টেম-এ এটা ধরা যায় না। এর জন্যে অন্য প্রসেসে বডি ওপন্ করতে হয়। যার নাম এয়ার এম্‌বলিজ্‌ম্ ।

—সেটা কি জিনিস ?

—খুব ইনটারেস্টিং। একটা বড় বাথ টাব-এর মধ্যে বডিটাকে শুইয়ে দিয়ে টাবটা কানায় কানায় জল ভর্তি করে দিলে নিশ্চয় সেখানে কোন বাতাস থাকবে না—

—না।

—এবার ঐ অবস্থায় খুব সরু আর তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে হার্টটা ওপন করলেই যদি বাব্‌ল দ্বারা রেসপিরেশন চোক্‌ড্‌ হয়ে থাকে তাহলে সেই বাব্‌ল্‌টা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। আর অবধারিত নিয়মে দুটি বাব্‌ল্ পাপড়ির হার্ট থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করে দিয়েছে ভেনে কোন মেডিসিন অ্যাপ্লাই না করে কেবলমাত্র দুটি বুদবুদে চিরদিনের মত তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এটা হত্যা!

আমার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই একটা বাক্য নির্গত হল—উঃ, শালা মানুষের কি বুদ্ধি!

নীল বলল—বড় সর্বনেশে বুদ্ধি রে। এখন এই সর্বনেশে লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কাউকে সন্দেহ করেছিস ?

—দূর! সব কিছু অগাধ জলে। ভালো করে লোকগুলোর

সঙ্গে পরিচয়ই হল না, কে কি কেমন তাই জানলাম না।

—আচ্ছা, তুই ত একবার বলেছিলি হত্যার চরিত্র দেখে হত্যাকারীর ইমেজ পাওয়া যায়।

—এখনও তাই বলছি।

—তাহলে ত প্রথমেই মনে আসবে অরিন্দম বসুর কথা।

—ডাক্তার বলে? কেন কোন কম্পাউণ্ডার হলে তার অসুবিধাটা কোথায়?

—না, তা নয়। কিন্তু কম্পাউণ্ডার এখানে আর কে আছে?

—থাকতে পারে। আমরা ত আর সবাইকে চিনি না। কারো অতীত ইতিহাসও আমাদেব জানা নেই। আবার এও হতে পারে যে, যে হত্যা করেছে সে ডাক্তারও না অথবা কম্পাউণ্ডারও না।

-- তাহলে কি এইভাবে ইনজেক্ট করা সম্ভব?

—নয় কেন? ইনজেকশান দেওয়াটা সম্পূর্ণ প্র্যাকটিসের ব্যাপার। প্র্যাকটিস করলে তুই আমি যে কেউ ও কাজটা করতে পারি।

—হত্যাকারী তাহলে খুব রিস্ক নিয়েছিল বলতে হয়।

—কিসের?

—এক বাড়ি লোক। এত লোকের মধ্যে আবার যে সে নয়, সবার দৃষ্টি যার ওপর সেই কনেকেই হত্যা করা, তাও ছুরি বন্দুক দিয়ে না—এটা রিস্কি না?

—হয়ত রিস্ক ছিল। তবু আমার মনে হয়, হত্যাকারী ইচ্ছে করেই বেছে বেছে ঐ দিনটাই খুন করার পক্ষে সব থেকে সুবিধেজনক সময় বলে মনে করেছিল।

কেন?

সাধারণতঃ বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে হলে লোকে ব্যস্ত থাকে নানান কাজে। প্রত্যেকটা লোকই যখন তখন যেখানে খুশি যেতে পারে কাজের অজুহাতে। হত্যাকারীকে অন্য কেউ সে সময় যদি দেখেও

ফেলত, সে যা হোক একটা কিছু অছিলা দেখাতে পারত। দ্বিতীয়তঃ নানান কাজে লোকে ব্যস্ত থাকার দরুন কোন বিশেষ একজনকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া পাপড়িকে হত্যা করার পক্ষে আরো একটা সুবিধে, পাপড়ির একটা নিজস্ব ঘর আছে, সেখানে একটা অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ আছে। চট্‌ করে পাপড়ি ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা সে ঘরে ঢুকবে না।

নীলকে বাধা দিয়ে বললাম—-কিন্তু, বিয়ের দিন যতই সেপারেট ঘর থাক, কনের ঘরে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ঢুকবে। নানান্‌ কারণে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কনের ঘরেই তার সাজ-টাজগুলোর কাজ সারা হয়।

নীল বলল—কথাটা অযৌক্তিক নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হয় নি। কনের সাজা-টাজার ব্যাপারগুলো হয়েছিল অন্য ঘরে। আর বাসরটা হয়েছিল পাপড়ির নিজের ঘরে। আগেই বলেছি, হত্যাকারী ও-বাড়ির সকলের পরিচিত। এবং সে নিশ্চয়ই এই সব খবর জানত। আর জানত বলেই তার পক্ষে ঐ সময়টা বেছে নেওয়া সব থেকে যুক্তিসঙ্গত।

—কেন? পাপড়ি যদি বিয়ের আগে বাথরুমে না যেত?

—না-ও যেতে পারত। তবে সাধারণতঃ বাথরুম জায়গাটা এমনই যেখানে মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশী আপন করে পায়। সেখানে মানুষ নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে। সেখানে মানুষ নিজেকে যাচাই করে। এই মনস্তত্ত্বটা হত্যাকারীর জানা। জীবনের এক চরম মুহূর্তে, বিশেষ করে মেয়েরা, নিজের বাথরুমটা একবার ঘুরে যাবেই। অন্ততঃ একবারও আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড় করাবেই। তার ওপর সেটা কোন কমন বাথরুম না। ওটা ওর একান্তই ব্যক্তি-গত। এক্ষেত্রে তুই বলতে পারিস, আমার কল্পনাটা একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা ত তাই-ই ঘটেছে। শেষ বারের মত ও একবার বাথরুমে গিয়েছিল। যেটা হত্যাকারীর একান্তই কাম্য ছিল।

কি জানি নীলের ব্যাখ্যা ঠিক কিনা! কিন্তু ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নীল ভুল করছে না। তবু একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বেছে বেছে বিয়ের দিনটা বেছে নেবার কি আর কোন কারণ নেই?

—কে বলেছে নেই! আমি তা একবারও বলি নি। হয়ত শেষকালে দেখা যাবে বিয়ের দিনেই হত্যা করার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। আমি যা বললাম সবটাই অনুমানের ওপর।

নীলের দিকে অন্যমনস্কের মত একটু তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম— আচ্ছা, সেই প্রশ্ন দুটোর জবাব পেয়েছিস?

—কোন্ দুটো?

—সেদিন কার কান্নার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল? আর অ্যাকোয়ারিয়ামের গাছগুলো এলোমেলো কেন ছিল?

—না। তাই ত আজ এখনই ও-বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।

—তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। চল।

জামা-কাপড় আমার পরাই ছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে লাহিড়ীবাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

নীল কিন্তু সোজাসুজি রামতনুবাবুর বাড়ি ঢুকল না। গলির থেকে একটু দূরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে বলল—চল্—একটু ঘুরে যাওয়া যাক।

সামান্য একটু ঘুরে লাহিড়ীবাড়ির একেবারে পিছনের দিকে চলে এলাম। দুনিয়ার যত নোংরা আর আবর্জনায় অপরিষ্কৃত গলিটা। ঠিক গলি বলা যায় না। পগার বলতে হয়। তিন থেকে চার ফুট চওড়া একটা সরু রাস্তা দু'দিকের বাড়িগুলো আলাদা করে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। লাহিড়ীবাড়ির ঠিক পেছনেই একটা টিনের শেড দেওয়া, হয় লেদের কারখানা নয়ত গ্যারাজের পিছনের অংশ। নোংরা আবর্জনা ডিঙিয়ে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম পাঁচিলের

ধারে। একটা ছোট্ট খিড়কি দরজা ছাড়া পাঁচিলের ও-পাশে যাবার কোন রাস্তা নেই। পাঁচিলটাও বেশ উঁচু। প্রায় দু'মানুষ উঁচু পাঁচিলের মাথায় কাচের ভাঙ্গা টুকরো সাজানো। চোর-ছ্যাঁচড়ের হাত এড়াবার জন্যে। নীল একবার দরজাটা ঠেলে দেখল। ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে মেথর এসে পরিষ্কার করে চলে গেছে। দেওয়ালটাও ও একবার ভালো করে দেখে নিল। কিন্তু কোথাও কোন পায়ের ছাপ বা অন্য কোন রকম বিশেষ চিহ্ন নজরে পড়ল না। দেখতে দেখতে আপন মনেই বলল—আমার অনুমানই ঠিক। এ রাস্তাটা খুনী ব্যবহার করে নি। যা কিছু হয়েছে বাড়ির মধ্যেই। চল্, এবার ফেরা যাক।

লোহার গেটটার মুখেই দেখা হয়ে গেল সুতনুবাবুর সঙ্গে। তিনি বোধহয় কোথাও বেরুচ্ছিলেন। পাজামা পাঞ্জাবি পরা। গায়ে একটা খয়েরী রঙের আগাগোড়া জংলা কাজ করা আলোয়ান। সকালের উজ্জ্বল রোদে ভদ্রলোকের সুশ্রী মুখে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ লুকিয়ে রয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। মাত্র ক'দিন আগেই এই বাড়িতে একটা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। নিজের একমাত্র বোন বিয়ের ঠিক আগেই খুন হয়েছে। এর সঙ্গে পরিবারের সুনাম দুর্নামের অনেক কিছু রয়ে গেছে। বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে এ বিষণ্ণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। উনি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রথমে আমাদের খেয়ালই করেন নি। অন্যমনে মাথা নিচু করে গেটটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। নীলের ডাকে ফিরে তাকালেন, বললেন—কি আশ্চর্য। আমি যে আপনার বাড়িই যাচ্ছিলাম।

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে নীল বলল—আমার বাড়িতে? কেন বলুন ত?

ভদ্রলোক বোধ হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা বলতে চাইছিলেন না। তাই বললেন—যখন এসেই পড়েছেন, তখন চলুন বাড়ির

ভেতরে যাই। এভাবে ঠিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে—

—বেশ ত চলুন। আমিও অনেক দরকারে এখানে এসেছি।

সুতনুবাবুর পেছন পেছন আমরা ভেতরে এলাম। কত পরিবর্তন মাত্র এই ক'দিনেই। সামিয়ানা মেরাপ সব উঠে গেছে। সেদিন প্রসাধনের আড়ালে ভালো করে সব দেখা হয় নি। তাছাড়া কাজের বাড়ি। তার ওপর দুর্ঘটনা।

সকালের রোদটা এসে পড়েছে বাড়ির সামনের ছোট্ট লনটায়। এখনও খুঁটি পোঁতার দাগ রয়ে গেছে। ছিমছাম সাজানো লন। আগেকার আমলের সাদা পাথরের দুটো পরীর স্ট্যাচু। শীতকালীন কিছু লাল সাদা ফুলের বাহার। জাজিমের মত নতুন ঘাসের আস্তরণ। দুটো লোহার লম্বা বেঞ্চ মুখোমুখি পাতা রয়েছে।

সব কিছু থাকা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এ পাড়াটাই বোধহয় একটু নির্জন। তেমন লোকজনের আধিক্য চোখে পড়ে না। আর এ বাড়িটা ত নিস্তব্ধ হবেই। মাত্র ক'দিন আগেই সব কোলাহল থেমে গেছে। অথচ এখন কত আনন্দের দিন হতে পারত।

লন পেরিয়ে আমরা বৈঠকখানায় এসে পড়লাম। দিব্য প্রশস্ত ঘর। অত্যল্প কালের মধ্যেই যে ঘরের চুনকামের কাজ হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এখনও বইয়ের আলমারীগুলোর গায়ে দু' এক ফোঁটা করে কোথাও কোথাও রঙের ছিটে লেগে রয়েছে। তাছাড়া নতুন চুনের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। দেওয়ালে পূর্ব-পুরুষদের সব ছবি-টবি টাঙানো রয়েছে। প্রত্যেকটা ছবিতেই বড় বড় জুঁইয়ের মালা ঝুলছে। মালাগুলো একটু শুকিয়ে লাল্‌চে আকার ধারণ করেছে। দেখে মনে হল বিয়ের দিনে মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। কাঠের ব্লেডের দুটো সীলিং ফ্যান প্রশস্ত ঘরটার দু'ধারে ঝুলছে। বড় বড় তিনটে আলমারী। দুটোয় ঠাসা আইনের বই। অন্যটায় ফিজিওলজি আর মেডিক্যাল সায়ান্স-এর বই। একটু আশ্চর্য লাগল। এ বাড়িতে

একজন লোহার ব্যবসায়ী। অন্য জনের কোন সঠিক লাইন নেই। আর তৃতীয় জন চার্টার্ড। তাহলে এ বইগুলো কার ?

ঘরের ঠিক মধ্যিখানে মেহগনি কাঠের সোফাসেট। এগুলোও পুরনো কালের। এ ধরনের সোফা-টোফা আজকাল বড় একটা কেউ ব্যবহার করে না। একটা সাদা পাথরের বড় গোল টেবিল মাঝখানে পাতা।

সোফায় বসতে বসতে নীল জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী আপনি ত বললেন না, হঠাৎ আমার বাড়ি যাচ্ছিলেন কেন ?

—বলছি, সব বলছি। একটু বসুন, আমি চা বলে আসি।

—থাক না, চায়ের আবার কি দরকার ?

—সে কি হয় ? আপনি বলতে গেলে প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন।

বলতে বলতেই উনি বেরিয়ে গেলেন। নীল ওর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটা ঠেলে দিল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার বল ত ? এত আইনের আর মেডিকেলের বই এ বাড়িতে কেন ?

—কেউ হয়ত ডাক্তারী বা ওকালতি প্র্যাকটিস করত। খুব হালকা করে সিগারেটের ধোঁয়ার মতই কথাগুলো ভাসিয়ে দিল।

সুতনুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের সামনের সোফায় বসে অন্যমনস্কের মত কয়েক মিনিট সামনের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—সত্যি কথা বলতে কি জানেন মিঃ ব্যানার্জী, পুলিসের ওপর আমি ঠিক ভরসা করে উঠতে পারছি না। তার মানে আমি বলছি না পুলিসে এফিসিয়েন্ট স্টাফ নেই। অনেক আছেন। তবু, মানে আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না, মানে ঠিক বিশ্বাসটা তৈরি করতে পারছি না। তাই দু'দিন ধরে আপনার কথা বিশেষ করে ভাবছিলাম।

—কিন্তু আমি ত পুলিসের লোক নই।

—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে যাওয়া। আসলে পুলিস নানা ধরনের কেস-টেস নিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে, সামান্য একটা কেসের দিকে তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে না। তার ফলে অধিকাংশ কেসই কিছুদিন পর আস্তে আস্তে ধামা-চাপা পড়ে যায়। তাই এই কেসটার ভার আমি পার্সোন্যালি আপনার হাতে দিতে চাই। আমি চাই এটা যেন ধামা-চাপা পড়ে না যায়। আর এর জন্যে আপনার উপযুক্ত সম্মান দক্ষিণা দিতে না পারলেও ঠিক অসম্মানও করব না।

ধীর, সংযত এবং মার্জিত কণ্ঠস্বরে সুতনু কথাগুলো বললেন। ওঁর কথার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার ছাপ ফুটে উঠেছে।

নীল এবার বলল—কিন্তু মিঃ লাহিড়ী, আমি পুলিস না হলেও, পুলিসের ওপর মহলের অনুরোধে কেসটা আমাকে টেক আপ করতে হয়েছে সরকারী ভাবে। অতএব আপনার কুণ্ঠার কোন কারণ নেই। আপনি না বললেও এ কাজটা আমি নিয়ে নিয়েছি। এ একদিকে ভালোই হল। আপনাদেরও যখন ইচ্ছে একই তখন আশা করি আপনাদের থেকে সব রকম সাহায্য আমি পাব।

—নিশ্চয়ই। একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

—বেশ, আজ আমার এখানে আসার কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই।

—মনে হয়, খানিকটা।

—তাহলে আমার ক'টা প্রশ্নের সহজ উত্তর আপনাদের কাছ থেকে আশা করছি। কোন কিছু গোপন না করে উত্তরগুলো দিলে আমার তদন্তের কাজটা ইজি হয়।

—প্রশ্ন করুন। আমার জানা কোন কিছুই আমি গোপন করব না। কারণ আমি চাই আমার একমাত্র বোনের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে—শেষের দিকে সুতনুর গলার আওয়াজটা বেশ কঠিন শোনালো।

নীল এতক্ষণ একদৃষ্টে সুতনুর দিকে চেয়ে ছিল। ঐভাবে আরো কিছুক্ষণ থেকে হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল—আপনার বোনের, আই মীন পাপড়িদেবীর এটা বোধ হয় লাভ ম্যারেজের ব্যাপার ছিল—তাই না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি শুনেছিলাম, এই নিয়ে আপনাদের মধ্যে একটা পারিবারিক অশান্তি ঘটেছিল ? তাই কি ?

উত্তরটা দিতে গিয়ে সুতনু বোধহয় একটু ইতস্তত: করলেন। তারপর একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যা শুনেছেন তা ঠিক। পাপড়ির এই বিয়েটা এ বাড়ির প্রায় কেউই মেতে নিতে পারেন নি।

হুম করে নীল প্রশ্ন করল—আপনি ?

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা এলো না সুতনুর কাছ থেকে। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর বেশ দ্বিধা নিয়েই বললেন—শেষের দিকে আমি রাজীই হয়েছিলাম, কিন্তু প্রথম দিকে, সত্যি বলতে কি আমারও আপত্তি ছিল।

—কেন, জানতে পারি ?

—কোন দিক দিয়েই উদ্দালক পাত্র হিসেবে কম কিছু ছিল না। তার ভালো উপার্জন, দেখতে শুনতেও বেশ—কিন্তু—

—দয়া করে কোন কিছু গোপন করবেন না।

—জানি আজকের দিনে এসব নিয়ে কেউ কিছু ভাবে না। শহর জীবনে প্রায় সব মানুষই নিজের খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। দৈনন্দিন জীবনের হাজার চাহিদার খোরাক মেটাতে গিয়ে মানুষের অন্য কিছুতে মন দেবার সময় থাকে না, তবু, সেই মানুষই, অন্য মানুষের সামান্য ছিদ্র পেলে সেখানেই নাক গলানোর চেষ্টা যে করে না, তা নয়।

—আপনি কিন্তু এখনও আসল কারণটা বললেন না ?

—বলছি। উদ্দালকের একটা পারিবারিক স্ক্যাণ্ডাল রয়েছে।

—যেমন ?

—অনিন্দিতা মিত্রের নাম শুনেছেন?

—কে অনিন্দিতা? যিনি সিনেমায় অভিনয় করেন?

—হ্যাঁ। উদ্দালক সেই অনিন্দিতারই ছেলে!

—হুঁ। কিন্তু তাতে কি হল?

—আমরা আজকের ছেলেরা, আমরা এসব হয়ত মানি না বা সংস্কারে আমল দিই না। কিন্তু আমার বাড়ি এই শহরের একটা বনেদী পরিবার। আমার বাবা কাকা এঁরা কোন মতেই অভিনেত্রী মায়ের কোন ছেলেকে ঠিক জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি।

—অভিনেত্রীর ছেলের কি বিয়ে হয় না?

—কিছু মনে করবেন না। বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কারণ তিনি আমার মায়ের মতই। তবু অভিনেত্রী জীবনে বোধহয় কিছু না কিছু স্ক্যাণ্ডাল থাকে। অনিন্দিতা দেবীরও আছে। আর অভিনেত্রী অনিন্দিতাকে এ শহরের সবাই চেনে। তাই, তাঁর ছেলেকে ঠিক—আমি বোধহয় আপনার কাছে আমাদের বাড়ির সংস্কারকে তুলে ধরতে পারছি না।

—আমি বুঝতে পারছি সুতনুবাবু। কিন্তু তার জন্যে ত উদ্দালকবাবু দায়ী নন।

—না, কখনই নন। বরং ছেলে হিসেবে উদ্দালককে আমার খুব ভালো লাগে। যেমন স্বভাবচরিত্র, তেমনি শান্তশিষ্ট। আর খুব ব্রাইট ফিউচারের ছেলে। কিছু না হলেও গাইয়ে হিসাবেই দারুণ নাম করা ছেলে হবে ভবিষ্যতে। ওর অমায়িক ব্যবহারের জন্যেই আমি শেষ পর্যন্ত সব সংস্কার ঝেড়ে ফেলে এ বিয়েতে রাজী হয়েছিলাম।

—আপনার বাড়ির আর সকলে?

—রাজী কেউই হন নি। কিন্তু পাপড়ির জেদের কাছে সবাই এক রকম বাধ্য হয়েই নিমরাজী হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ও জানিয়েছিল, ও অ্যাডাল্ট। পছন্দমত যে কোন ছেলেকেই ও বিয়ে করতে পারে। বাড়ির সকলের যখন এতই আপত্তি তখন ও এ বাড়ির সঙ্গে

সব সম্পর্ক ত্যাগ করে উদ্দালকের সঙ্গে গিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধবে। বুঝতেই পারছেন, এক সম্মান বাঁচাতে গিয়ে আর এক কেলেঙ্কারিতে পড়তে হয়। লাহিড়ীবাড়ির মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বংশের সম্মানটা কোথায় থাকে?

মাথা নিচু করে নীল গভীর মনোযোগ দিয়ে সুতনুর কথা শুনছিল। আস্তে আস্তে ও মাথা তুলে এক সময় প্রশ্ন করল—আচ্ছা সুতনুবাবু, এ ব্যাপারে এ বাড়িতে সব থেকে আপত্তি কার বেশী ছিল।

—কাকা আর কাকীমার। বিশেষ করে কাকীমা বড় গোঁড়া।

—আপনার বাবা?

—আপত্তি ত ছিলই। এমন কি উনি একদিন রাগের মাথায় পাপড়িকে মেরেও ছিলেন। কিন্তু মা মরা মেয়ে, বোধহয় শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই বাবা রাজী হয়েছিলেন।

কয়েক সেকেণ্ড নীল কি যেন ভাবল। তারপর সরাসরি সুতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—এ বাড়িতে ডাক্তারী করেন কে?

আচমকা প্রশ্নে সুতনু একটু যেন বিব্রত বোধ করল। সেটা সাময়িক। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন—আমার দুই কাকা। দেবতনু আর অতনু লাহিড়ী। ওঁরা ছিলেন যমজ ভাই। দেবতনু কাকা পড়তেন ডাক্তারী আর অতনু কাকা আইন।

—দেবতনুবাবু কোথায়? তাঁকে ত সেদিন দেখলাম না।

—তিনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

—মারা গেছেন, তা কত বছর আগে?

—বাবার মুখে শুনেছি, প্রায় ঊনত্রিশ বছর আগে। তখন আমি খুব ছোট।

—তিনি বিয়ে করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে, তাঁরা কি এ বাড়িতেই থাকেন?

—তাঁর ছেলেমেয়ে নেই। তবে স্ত্রী আছেন। মানে আমার

সেই কাকীমা কাকা মারা যাবার পরই পাগল হয়ে গেছেন।

—কোথায় থাকেন ?

—এই বাড়িতেই। তবে ওঁকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হয় না।

এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে ও বলল—আজ ত রবিবার। নিশ্চয়ই বাড়িতে সবাই আছেন।

—হ্যাঁ, আছেন।

—আমি কিন্তু সকলকে কিছু না কিছু প্রশ্ন করব। আপত্তি নেই ত ?

—আগেই বলেছি, আপনার তদন্তের জন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব সব কিছুই করব।

—এবার তাহলে আপনার বাবাকে—

—আপনি বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।

সুতনু বেরিয়ে গেলেন। উনি চলে যাবার মিনিটখানেক পরই একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক চা বিস্কিট আর মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রে নামিয়ে রেখে ও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ নীলের গলার আওয়াজ পেলাম—তুমিই সুদাম ?

লোকটা চলেই যাচ্ছিল। নীল গলা চড়িয়ে ডাকল—এই যে শোনো।

আওয়াজটা বোধহয় কানে ঢুকেছিল। লোকটা ফিরে তাকাল। নীল হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকল।

—তোমারই নাম সুদাম ?

—আজ্ঞে ?

—বলছি, তোমার নামই ত সুদাম ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ বাড়িতে কতদিন আছ ?

—তা আজ্ঞে বছর তিরিশ।

—রোজ সকালে জমাদারকে খিড়কির দরজা খুলে দেয় কে ?

—আজ্ঞে আমিই।

—তোমার দিদিমণি যেদিন মারা গেলেন সেদিন কে খুলেছিল?

—আজ্ঞে আমিই।

—জমাদার আসে কখন?

—আজ্ঞে শীতকালে একটু দেরিই হয়। বোধ করি সাড়ে ছ'টা হয়।

—খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে কে?

—আজ্ঞে আমিই করি।

—সেদিনও তুমিই করেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঠিক করে মনে করে বল।

—আজ্ঞে, তা ঠিক স্মরণে আসছে না।

—তার মানে?

—আজ্ঞে বাবু, বুড়ো হয়েছি, আজকাল আর তেমন স্মরণশক্তি নাই।

—ঠিক করে মনে করে দেখ ত সেদিন খিড়কির দরজা দিয়েছিলে কিনা?

—অনেকদিনের কথা বাবু, ঠিক মনে নাই। সেদিন আবার অনেক কাজের ফরমাশ ছেল কিনা! ছোটবাবু মাছ আনার তাগাদা দিচ্ছিলেন ত—

—মাছ আনার কথাটা মনে আছে আর এটা মনে নেই?

—আজ্ঞে বাবু, সূক্ষ্ম কথা তেমন মনে থাকে না।

—তোমার দিদিমণি কেমন লোক ছিলেন?

—আজ্ঞে হীরের প্রিতিমা, আমারে বড় ভালোবাসতেন।

বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। লোকটা বোধহয় পাকা অভিনেতা। অন্ততঃ আমার তেমন মনে হল। দু'শ্রেণীর মানুষ হঠাৎ হঠাৎ কাঁদতে পারে। এক, সত্যিকারের যার মনে দুঃখ থাকে; আর এক, পাকা অভিনেতা। সুদামের কান্নার মধ্যে

আন্তরিকতার চেয়ে অভিনয়টাই প্রথম মনে পড়ে। নীলও ওর কান্নাকে কোন আমল দিল না। প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল,—ওসব কান্নাকাটি পরে কোরো, যা জিজ্ঞাসা করছি উত্তর দাও।

লোকটা সত্যিই অভিনেতা। নিমেষে কান্না থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। হাঁ করে নীলের দিকে বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে।

—আমাকে চেনো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করে?

—সেদিন যেন দারোগাবাবুর সঙ্গে এয়েছিলেন?

—তবে যে শুনলাম তুমি চোখে ভালো দেখতে পাও না?

সুদামের চোখ দুটো হঠাৎ বেশ বড়ো হয়ে গেল। মনে হল একটা ভয়ের ক্ষীণ রেখাও যেন ওর দু'চোখে উঁকি দিতে শুরু করেছে। নীল আবার সেই ধমকের সুরে বলে উঠল—তাকিয়ে আছ কি? যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

—আজ্ঞে মাঝে মাঝে কম দেখি বাবু।

—বাঃ, চমৎকার! তা আমাকে যখন চিনেইছ তখন বুঝতে পেরেছ ত আমি তোমাকে এক্ষুণি গারদে পুরে দিতে পারি।

—আজ্ঞে বাবু, আমি কি অপরাধ করলুম?

—মিথ্যে কথা বলছ, তাই।

—আজ্ঞে না বাবু।

—ফের চালাকি হচ্ছে?

—না বাবু।

—তোমাদের আর এক কর্তা কতদিন আগে মারা গেছেন?

—তা বাবু আমি যে বছর এলুম ত সেই বছরেই।

—একটু আগে বললে, তোমার পুরনো কথা কিছুই মনে থাকে না।

—সে ত বাবু খুব সূক্ষ্ম কথার কথা বলেছিলুম।

নীল বোধহয় আবার ধমকাতে যাচ্ছিল। এমন সময় রামতনু লাহিড়ী এসে ঘরে ঢুকলেন। পিছনে সুতনু।

ওঁদের দেখে সুদাম যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কোন রকমে নীলকে নমস্কার করেই এক রকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীল একটু মুচকি হেসে রামতনু লাহিড়ীকে হাত তুলে নমস্কার করল। সুঠাম সুদেহী লাহিড়ীমশাইকে কেমন যেন কৃশ আর ক্লান্ত লাগল। চোখের তলায় খুব হালকা একটা কালিমা জড়িয়ে রয়েছে। আভিজাত্যময় পুরুষটি যে সদ্য কন্যা হারানোর ব্যথায় ম্রিয়মাণ, তা ওঁকে দেখলেই বোঝা যায়। নীলকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সামনের সোফায় বসলেন। সুতনু এগিয়ে এসে বললেন —বাবা, ইনিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জী। কাল এঁর সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। পাপড়ির কেসটা উনি অ্যাকসেপট করেছেন। তারপর নীলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মিঃ ব্যানার্জী, বাবার সঙ্গে আপনি কথা বলুন। আমি যাই। বোধহয় আমার এখন থাকার প্রয়োজন নেই। তবে আমি ওপরে আছি। ডাকলেই আসব।

সুতনু বুদ্ধিমান। সে জানে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তার থাকাটা অনুচিত। সুতনু চলে গেলে নীল একটু সঙ্কোচ নিয়ে লাহিড়ীমশাইকে বলল—আমি জানি, এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করা আমার পক্ষে খুব অন্যায় কাজ হচ্ছে। তবু, দায়িত্বটা যখন আপনাদের দিক থেকেও আমার কাছে এসেছে তখন অপ্রিয় হলেও কিছু যদি প্রশ্ন করি, দয়া করে মানিয়ে নেবেন।

খুব গম্ভীর এবং মৃদু স্বরে লাহিড়ীমশাই বললেন—যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার। আমিও জানি এসবের প্রয়োজন আছে। কি জানেন মিঃ ব্যানার্জী, পাপড়ি আমার বড় ভালো মেয়ে ছিল। সে চলে গেছে বলে বলছি না, জীবনে যেটাকে ন্যায্য বলে মনে করেছে, তাই-ই করেছে। অন্যায়কে সে কখনও

প্রশয় দেয় নি। শুনেছেন বোধহয়, মেয়ে আমার ভালোবেসেছিল একটি ছেলেকে। ভালোবাসাটাকে সে সৎ আর সুন্দরভাবে নিয়েছিল। তাই সে আমাদের সংস্কারকে মূল্য দেয় নি। না দিক। তার জন্য আজ আর আমার কোন অনুযোগ নেই। আমি তার জেদকে মেনেই নিয়েছিলাম। তবু শেষ রক্ষা হল না।

শেষের দিকে ওঁর গলাটা কেমন যেন ধরে এলো। একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, আমার পাপড়ি-মার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটাকে যে এমনভাবে কেড়ে নিয়েছে, মিঃ ব্যানার্জী, আমি তার শাস্তি চাই। যেমন করে পারেন তাকে খুঁজে বার করুন। সেই নৃশংস পশুটাকে আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, পাপড়ি তার কি ক্ষতি করেছিল?

উনি থামতে ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো। নীল কয়েক মিনিট সময় নিলো এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে। এক সময় সে প্রশ্ন করল,—লাহিড়ীমশাই, আপনাকে বেশীক্ষণ আমি বিরক্ত করব না। দু' একটা প্রশ্ন আমার জানার আছে।

—বেশ ত, বলুন।

—পাপড়িদেবীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

—কাকে সন্দেহ করব? কে আমার এমন শত্রু আছে তাও জানি না। জানি না তাকে মেরে কার কি লাভ হল?

—আপনার আর এক ভাই ত অনেক দিন আগে মারা গেছেন?

—হ্যাঁ, প্রায় ত্রিশ বছর হবে।

—কি হয়েছিল তাঁর?

—পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টালি গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়।

—এ নিয়ে কোন ইনভেস্টিগেশান হয়েছিল?

—হয়েছিল। ও খুব মদে অ্যাডিক্টেড ছিল। মদের ঝোঁকেই—

ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।

—উনি ত বিয়ে করেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—ওঁ স্ত্রীর শুনলাম মাথা খারাপ ?

—হ্যাঁ, দেবতনু মারা যাবার পরই বৌমার মাথাটি যায়। এখন তো টোট্যালি ম্যাড্।

সামান্য একটু ভেবে নিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল—আপত্তি না থাকলে বলুন, আপনি কোন উইল-টুইল করেছেন ?

—একটা উইল আমি করে রেখেছিলাম। আর বোধহয় তার প্রয়োজন নেই।

—বয়ানটা কেমন ছিল বলবেন ?

—আমার সব কিছু মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করেছিলাম। অবশ্য দুই বৌমার নামে ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ফিক্স্ড্ ডিপোজিট করা আছে। আমার মৃত্যুর পর ওঁরা সে টাকাটা পাবেন। আমার ছেলে মেয়ের তাতে কোন অধিকার থাকবে না। অবশ্য আমার পাগল ভ্রাতৃবধূটির প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজারের জিম্মাদার থাকবে আমার ছেলে সুতনু আর অ্যাটর্নী মিঃ সেন। আমৃত্যু বৌমার কারণেই সে টাকাটা খরচ করা হবে।

—অর্থাৎ ঐ এক লাখ বাদে বাকী যা কিছু সব সুতনুবাবু আর পাপড়িদেবীর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু শুনেছিলাম এটা আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসা।

—ঠিক শুনেছেন। তবে বর্তমানে ব্যবসার সম্পূর্ণ মালিকানা আমার। ভাইদের কোন অংশ নেই।

—তাহলে এ বাড়ির মালিকানাও আপনার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবার উইল অনুসারে এ বাড়ি এবং ব্যবসা সবই আমার। অন্য দু' ভাইকেও একটি করে বাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

পরে দেবতনু আর অতনু আমাকে তাদের বাড়ি বিক্রি করে দেয়। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সবই দেখাতে পারি।

—আপনার বক্তব্য অনুসারে সম্পত্তির অধিকাংশই আপনাকে দেওয়া হয়েছে, কেন, তা জানতে পারি কি?

—আমার জীবিত ভাই অতনুকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

—লাহিড়ীমশাই, আর একটি মাত্র প্রশ্ন। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আপনার মেয়ে, আই মীন পাপড়িদেবীর ঘরের চাবিটা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা কি পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, পরদিন সকালে বাড়ির পিছনের বাগান থেকে পাওয়া গেছে। সুদামই আমাকে এনে দিল।

—ভারি মজার ব্যাপার! ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন। দয়া করে যদি আপনাব ভাইকে—

—বেশ, পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলতে বলতে উনি চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরেই অতনুবাবু এসে হাজির হলেন।

নীলই প্রথম প্রশ্ন করল—চিনতে পারছেন?

—এমন সুন্দর চেহারার বুদ্ধিমান মানুষকে কি চিনতে দু' দিন সময় লাগে?

—তা ত বটেই। তা আজ রোববার। কোথাও যান নি?

—নাঃ, রোববারটা সাধারণতঃ বাড়িতেই থাকি। সারা সপ্তাহ ধরে হাজার হাজার মাইল চষে বেড়াতে হয়। একদিন না রেস্ট করলে চলে? আর বয়সও ত হচ্ছে।

—আপনি বোধহয় শুনেছেন আজ আমি কেন এখানে এসেছি?

—প্রশ্ন করবেন ত? করুন।

—আপনার ভাইঝি যেদিন মারা যান, অর্থাৎ ওঁর বিয়ের দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

—শ্রীরামপুর।

—সেকি! বাড়িতে বিয়ে অথচ আপনি শ্রীরামপুর কেন?

—একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাপার ছিল।

—ফিরেছিলেন কখন ?

—ইচ্ছে ছিল সকাল সকালই ফিরব। তা আর হল না। ট্রেনের গণ্ডগোল। তা ফিরেছি আপনার প্রায় সাতটা নাগাদ।

—বাড়িতে ফিরে আপনি কি দেখলেন ?

—হইচই চেঁচামেচি। সবাই পাপড়ির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা ভেতর থেকে লক করা।

—আপনি কি করলেন ?

—দাদার কাছ থেকে ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আনিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলুম।

—কিন্তু আরো একটা দরজা ত ছিল ?

—আরো দরজা মানে ?

—মানে বাথরুমের পেছনের দরজা।

—ও, হ্যাঁ তা ছিল। কিন্তু তখন আর ওসব কথা মনে আসে নি। তাছাড়া ও দরজাটাও ত ভেতর থেকে বন্ধ থাকে।

—স্বাভাবিক। আপনারা ভেতরে গিয়ে দেখলেন উনি মৃত—

—প্রথমটা বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম হয়ত অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেছে।

—এরকম মনে হল কেন ? ওঁর কি ফিটের ব্যারাম ছিল ?

—না না, কোনোদিন শুনি নি। তবে মরার কথা চট্‌ করে কারো সে সময় ভাবার কথা নয়। বিশেষ করে যে মেয়ের একটু পরেই বিয়ে।

—এ বিয়েতে ত আপনারও আপত্তি ছিল ?

—ছিল।

—পরে আবার রাজীও হয়েছিলেন ?

—কি করব বলুন। বাড়ির একমাত্র মেয়ে। আমার নিজের কোন ছেলেমেয়ে না থাকায় ওকেই আমি মেয়ের মত মানুষ করতুম।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই মত দিয়েছিলুম। অবশ্য আমার মতামতে কি যায় আসে। দাদার মত না থাকলে কিছুতেই কিছু হত না। দাদা জেদী মানুষ।

হঠাৎ নীল সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—অতনুবাবু, এ বাড়িতে ত আপনার কোন অংশ নেই—তাই না?

অত্যন্ত নির্লিপ্তের মত অতনু বললেন—আজ্ঞে না।

—কেন জানতে পারি?

—আমার বাবার মর্জি।

দেখলাম ভদ্রলোক বাবার এই খামখেয়ালিপনায় বেশ অসন্তুষ্ট। নীল আবার প্রশ্ন করল—আপনার নিজের কোন ধারণা নেই, তাই না?

—না।

—আপনি ছোটবেলায় ডাক্তারী পড়েছিলেন তাই না?

—হেসে উঠলেন অতনুবাবু। বললেন, না, ডাক্তারী পড়ত আমার টুইন ব্রাদার দেবতনু। আর আমি পড়তাম আইন। অবশ্য তুজনের কেউই শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারি নি। আমার ভালো লাগে নি। দেবুর ব্যাপারটা সে-ই জানত।

—হুঁ। আচ্ছা, পাপড়িদেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

এতক্ষণ অতনুবাবু বেশ সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিচ্ছিলেন। কোন জড়তা বা দ্বিধার কিছু ছিল না। হঠাৎ নীলের এই প্রশ্নে ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে অন্যমনস্কের মত নীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গলার স্বরটা খুব নিচু করে বললেন—হয়। একজনকে।

—কাকে?

—বলাটা কি ঠিক উচিত হবে?

—এ আপনার নিছক সন্দেহ। তাছাড়া আমি ত আর কাউকে

কিছু বলতে যাচ্ছি না।

—অরিন্দম বসুকে।

—অরিন্দম বসু? মানে আপনাদের হাউস ফিজিসিয়ান?

—ফিজিসিয়ান না ঘেঁচু। বেটা পয়লা নম্বরি বজ্জাত। একটা রাঙামূলো।

—কিন্তু আমি ত জানতাম উনি একজন ভালো ডাক্তার। ওঁর বাবাও আপনাদের পরিবারের অতি পরিচিত।

—সেটাই ত হল কাল মশাই। ভেবেছিলুম, ছেলে এ বাড়ির জায়গা নেবে। ছোঁড়া প্রথম দিকে বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু পাপড়িকে দেখার পর থেকেই ওর মাথাটা গেল ঘুরে। নিজের বিয়ে করা বউকে তালাক দিয়ে পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। আমাদের বংশে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। তাছাড়া পাপড়ি ওকে পাত্তা দিল না। দেবেই বা কেন? উদ্দালকই ওর ধ্যান-জ্ঞান। কি ভালোই না বাসত সে উদ্দালককে। ত, তখন ঐ বজ্জাত মূলোটা কি করল জানেন? যখন দেখল মেয়েটা আর একটা ছেলেকে ভালবাসে, তাকে ছাড়া অন্য কোন ছেলেকে সে বিয়ে করতে কোন মতেই রাজী নয়, তখনই আরম্ভ করল বাগড়া দেওয়া।

—কি রকম বাগড়া?

—আরে ঐ ত সব খুঁজে-টুঁজে উদ্দালকের ফ্যামিলি হিস্ট্রি বার করেছে। ঐ ত দাদার কাছে গিয়ে দাদার কান ভাঙ্গিয়ে বিয়েটা নাকচ করতে চেয়েছিল। উদ্দালক সম্বন্ধে আমরা ত প্রায় কিছুই জানতুম না। ওই প্রথম এসে বলল, ওর মা সিনেমা করে। ওদের ফ্যামিলিটা ভালো নয়।

—তারপর?

—বাড়িতে তখন এইসব ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি চলছে। স্বভাবতঃই আমারও মন খুব খারাপ ছিল। কারণ তার দিন দুয়েক

আগে দাদা জীবনে যা করেন নি তাই করেছিলেন। রাগের মাথায় পাপড়িকে ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ি ফিরে একবার ভাবলুম মামণির কাছে যাই। আদর করে পাপড়িকে আমি মামণি বলে ডাকতুম। ওর ঘরটা তেতলায়। সিঁড়ি পেরিয়ে ওর ঘরের কাছে এসেছি, হঠাৎ শুনতে পেলুম মামণির ঘর থেকে চাপা কথাবার্তা ভেসে আসছে। একজন পুরুষ। একজন মহিলা।

মেয়েটির আওয়াজ চেনা। মামণি। কিন্তু ছেলে-গলার আওয়াজটা চেনা চেনা হলেও ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। কেমন যেন কৌতূহল হোল। পাপড়ির ঘর থেকে ত কোন অপরিচিত ছেলের কণ্ঠস্বর আসতে পারে না। তবে কি পাপড়ি উদ্দালককেই এনে হাজির করল ?

আশ্চর্য লাগল। পাপড়ির এত সাহস হবে ? বাড়িতে যখন উদ্দালককে নিয়ে এত ঝামেলা চলছে তখনই ও উদ্দালককে নিয়ে এলো ? মনে মনে ভাবলুম প্রেমে পড়লে মানুষ সত্যিই সাহসী হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েরা। তার ওপর আবার এ যুগের এম. এ. পাস করা মেয়ে। কৌতূহল দমন করতে পারলুম না। পা টিপে টিপে দরজার গায়ে কান লাগিয়ে শুনতে গেলুম কি কথা হচ্ছে।

স্বীকার করছি মশাই কাজটা অন্যায়। অভিভাবকই হই আর যাই হই যুবতী ছেলেমেয়ের কথায় আড়ি পাতা অনুচিত। তবু অভিভাবকের অহঙ্কারটা যাবে কোথায় ?

ওদের কথা শুনতে গিয়েই ভুল বুঝতে পারলুম। উদ্দালক নয়। ঐ ডাক্তার অরিন্দম বসু। ছোকরা তখন বলছে—ভেবে দেখো পাপড়ি, উদ্দালকের কাছে তুমি কিই বা পাবে ? না পাবে বংশমর্যাদা, না পাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। একটা সামান্য অফিসের জুনিয়ার অফিসার। আর একটু গান-টান জানে। এই সামান্য গুণের জন্যে উদ্দালককে তোমার বিয়ে করা উচিত নয়। বরং তুমি কত কি হারাবে ভেবে

দেখ। লোকে বলবে তুমি একজন অভিনেত্রীর ছেলেকে বিয়ে করেছ। মাথাটা কোথায় নেমে যাবে ভেবেছ? কত বড় বংশের মেয়ে তুমি তা ভুলে যেও না।

উত্তরে পাপড়ি বলেছিল, বাঙালির মেয়েরা জীবনে একবারই বিয়ে করে, এটা আপনার জানা উচিত ছিল ডাক্তার। এও জানা উচিত ছিল, মেয়েরা কাউকে ভালোবাসলে চট করে অন্য কোন পুরুষকে সে জায়গায় বসাতে পারে না। আর বংশ, মান, সামাজিক মর্যাদা? মেয়েদের একমাত্র গর্ব তার প্রেমিকের ভালোবাসা পাওয়া। আর কিছুতে নয়।

ডাক্তার বলেছিল—ঘোর লাগা চোখের ওপর থেকে রঙীন চশমাটা সরিয়ে নিলে দেখতে পেতে জীবনে এক অসাধারণ ভুল করতে চলেছ।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পাপড়ি বলেছিলো—ভুলে যাবেন না ডাক্তার আমি পাপড়ি লাহিড়ী। স্রোতের মুখে ভেসে যাবার মতো খড়কুটো হয়ে জন্মাই নি। ভালোবাসার মানুষকে বুকের মধ্যে আগলে রাখার ক্ষমতা আমার আছে।

—এই তোমার শেষ কথা?

—শেষ কথা অনেক আগেই বলেছি। নতুন করে বলার কিছু নেই।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে অতনু বললেন—উত্তরে চামারটা কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, আচ্ছা, আমিও অরিন্দম বসু। আমিও দেখব কেমন করে তুমি উদ্দালককে পাও?

হঠাৎ চেয়ার সরানোর আওয়াজ শুনে আমি সরে গিয়েছিলাম। একটু পরেই ডাক্তার হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল। আমার তখনই মনে হয়েছিল ডাক্তারকে ঘুরিয়ে একটা চড় কষাতে। মিঃ ব্যানার্জী, আমি আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এই ডাক্তারই মামণিকে খুন করেছে।

আচমকা অতনু চেয়ার থেকে উঠে এসে নীলের হাত দুটো

জড়িয়ে ধরে বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আপনি যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন ঐ ব্যাটাই খুনী, বিশ্বাস করুন, চিরজীবন আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমাদের মেয়েকে যে খুন করেছে তাকে আমি জ্যান্ত কবর দিতে চাই। প্লীজ, আপনি কথা দিন।

ধীরে ধীরে নীল হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আপনি শান্ত হোন অতনুবাবু। আমি কথা দিচ্ছি সত্যিকারের খুনীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। একটা কথা মনে রাখবেন, ক্রাইম ডাজ নেভার পে। খুনী একদিন ধরা পড়বেই। কিন্তু তার জন্যে আপনাদের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। বিয়ের দিন আপনাদের এখানে মালতি নামে একজন কাজের মেয়েকে দেখেছিলাম। সে কি এখানেই থাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

—ঠিক আছে। আমি তাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলেই উনি চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নীল বলে উঠল—অতনুবাবু, সে তো বাড়ির মধ্যেই আছে। আমি কথা বলে নোব'খন। তবে তার আগে এ বাড়িটা আমি দেখতে চাই। আপত্তি নেই ত?

—না না। আপত্তি কিসের? চলুন না।

অতনুবাবুর পেছন পেছন আমরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম। বাড়িটা বেশ বড়-সড়। সেদিন লোকজনের ভিড়ে অতটা বোঝা যায় নি। নিচের তলাটা একদম ফাঁকা। ঢুকতেই ঠাকুরদালান। চৌকো আকারের উঠোন। লম্বা সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়ে ঠাকুরদালানে মিশেছে। ওখানে একটা কাঠের বড় সিংহাসন। বোঝা যায়, সব পুজো-টুজো এখানেই হয়। বাঁদিক দিয়ে ওপরে সিঁড়ি উঠে গেছে। নীল অতনুবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী, নিচের ঘর-গুলো কি ফাঁকাই থাকে?

—হ্যাঁ। এক রকম ফাঁকাই বলতে পারেন। কেবল ডান দিকের

ঐ কোণের ঘরটায় সুদাম থাকে। সুদামের ঘরটা কি দেখবেন ?

—না থাক। চলুন ওপরে যাওয়া যাক।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে এলাম। সারা বাড়ির মেঝেই শ্বেত পাথরের। একতলার সঙ্গে সমতা রেখেই দোতলার ঘরগুলো সাজানো। দোতলায় মোট পাঁচখানা ঘর। সব কটা ঘরই বেশ প্রশস্ত।

—আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী, দোতলায় কারা থাকেন ?

—এই যে সামনের দুটো ঘর, এ দুটোয় আমরা থাকি। মানে আমি আর আমার স্ত্রী। ওই যে ওপাশের কোণের ঘরটা ওটা রান্না-ঘর। তার পাশেই ভাঁড়ার।

—আপনাদের কি জয়েণ্ট ফ্যামিলি ?

—হ্যাঁ। দাদা চান না তিনি বেঁচে থাকতে হাঁড়ি আলাদা হোক।

—আচ্ছা, তেতলায় ওঠার মুখে ঐ যে সিঁড়ির পাশের ঘর, ওটায় কে থাকেন ?

—ওটায় দেবতনুর স্ত্রী থাকেন।

—দরজায় তালা ঝুলছে। উনি কি এখন বাড়িতে নেই ?

—উনি বাড়ির বাইরে কোথাও যান না। মানে, ওনার মাথার ঠিক নেই। উন্মাদ বলতে পারেন। তাই বাধ্য হয়েই দরজায় তালা দিয়ে রাখতে হয়।

নীল আর কিছু বললে না। তিন তলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল—আপনার দাদা কোথায় থাকেন ?

—দাদার পুরো পরিবারই তিনতলায় থাকেন।

—আপনার স্ত্রী কোথায় ? তাঁকে ত দেখছি না ?

—বোধ হয় রান্নাবান্নায় ব্যস্ত আছেন। ডেকে দোব ?

—আপনি ত ঐ ঘরটায় থাকেন। চলুন না, আপনার ঘরেই একটু বসি। সেই ফাঁকে মিসেস লাহিড়ীর সঙ্গেও কথা বলে নোব।

—বেশ ত, বেশ ত, তাই চলুন।

নীল যে ঠিক কি করতে চাইছে, আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি

না। ওর মস্তিষ্ক যে কখন কোন্ দিকে চলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে আবার ফিরে চলল অতনুবাবুর ঘরের দিকে।

অতনুবাবুর ঘরটা কিন্তু তেমন সাজানো গোছানো না। সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো। খানিকটা আগোছালো গৃহিণীর মত। এক-দিকে ডাঁই করা বাসি কাপড় লুঙ্গি গেঞ্জি। অন্যদিকে খাটের ওপর আধখোলা মশারি। বালিশ-টালিশ সব এদিক ওদিক ছড়ানো। একটা বই আধখোলা অবস্থায় উপুড় করা রয়েছে। পাশেই একটা ট্রানজিস্টার রেডিও। আসবাবপত্রেরও তেমন বাহুল্য নেই। সাদৃশ্যও নেই। একটা মান্ধাতা আমলের পালঙ্ক। সেখানে নাইলন মশারি টাঙানো। অন্যদিকে গোদরেজ আলমারি। চাবিটা তখনও ঝুলছে। তারই পাশে একটা পুরনো কালের বই-এর আলমারি। এটা-সেটা কিছু বই-এর সঙ্গে কয়েকটা কাচের পুতুল। আবার তার মধ্যে অন্য-র‍্যাকে কয়েকটা সোয়েটার, শাল, কোট এলোপাথাড়ি ঢোকানো রয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন মেয়েদের ব্যবহৃত কিছু দেখা গেল না।

তবে এক কথায় সমস্ত ঘরটাই বড় অপরিষ্কার। অতনুবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঘরের একপাশে রাখা এখানে সেখানে স্প্রিং সরে যাওয়া আদ্যিকালের একটা সোফার ওপর পড়ে থাকা গামছা-লুঙ্গি সরিয়ে আমাদের বসতে বললেন।

বসার ইচ্ছে আমাদের দুজনের কারোরই ছিল না। নীল কি ভাবছিল জানি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ কি রকম ব্যাপার রে বাবা! ঠিক এর ওপরের ঘরটা ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো, আর সেই একই বাড়ির নিচের ঘরটার এই অবস্থা কেন? তবে কি অতনুবাবুর আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অভাব? নাকি স্বামী-স্ত্রী দুজনের স্বভাবেই পরিচ্ছন্নতার অভাব? নাকি এঁদের দাম্পত্য জীবন এই ঘরটার মতোই ছড়ানো ছিটনো?

বসব কি বসব না ভাবছিলাম। হঠাৎ কাংস্যবিনিন্দিত মহিলা-

কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরে তাকালাম। মধ্যবয়েসী এক ভদ্রমহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। আগেও এঁকে দেখেছি। মানে বিয়ের দিন। সিম্পল লায়ন যার হুঙ্কারে সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন।

—বলি হলটা কি ? সাত তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে—

দুজন প্রায়-অপরিচিত পুরুষকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে ওর মুখে রাগের প্রকোপটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল মনে হল। মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন—তোমার কি আক্কেলজ্ঞান মরার আগেও হবে না ? এরা কারা ?

বিব্রত এবং কাঁচুমাচু মুখে অতনুবাবু বললেন—না, মানে, এই পাপড়ির ব্যাপারে এঁরা একটু এসেছিলেন।

ঝাঁজ ঘণ্টা বেজে উঠল একসঙ্গে—ত এখানে কী ? এটা কি পাপড়ির ঘর ? যান যান, আপনারা ওপরে যান। পাপড়ি ওপরে থাকত।

অতনুবাবু বাধা দিতে গেলেন স্ত্রীকে—আহা, ওঁদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলছ কেন ? ওঁরা পুলিসের লোক।

সমস্ত ঝঙ্কারটা গিয়ে পড়ল অতনুবাবুর ওপর—পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে ? বলি পুলিসের লোক আমার ঘরে ঢুকবে কেন শুনি ? আমরা চোর না ছ্যাঁচোড় ? না আমরাই পাপড়িকে খুন করেছি। এটা কি মগের মুলুক ? যা খুশি তাই করে যাবে ? আর চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছ ? দেখতে পাও না ঘরদোরের কি অবস্থা ? কোথাকার কে না কে, হুট করে ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছ ? বলি তোমার এত আদিখ্যেতা কেন ? অ্যাঁ ? এত আদিখ্যেতা কিসের ?

এই মুহূর্তে আমার এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। জীবনে এমন অসভ্য মহিলা আর একটাও দেখি নি। নীলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত মুখটা ওর লাল হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও মহিলাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে ও

বলে উঠল—অযথা উত্তেজিত হবেন না মিসেস লাহিড়ী। আমরা এখানে ছেলেখেলা করতে আসি নি। আপনাদের মেয়ে পাপড়িদেবীর হত্যা রহস্যের তদন্ত করতেই পুলিসের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। যদি আমাদের তদন্তের কাজে কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে বাধ্য হব আপনাকে পুলিসের হেফাজতে তুলে দিতে। বোধ হয় সেটা আপনার সম্মানের পক্ষে উপযুক্ত হবে না।

কোন মহিলার সঙ্গে এর আগে নীলকে এ ধরনের কথা বলতে আমি শুনি নি। তবে এই মহিলার দুর্ব্যবহারের যোগ্য উত্তর বোধ হয় এটাই। শক্তের সঙ্গে শক্তই হতে হয়। তাতে কাজও হল। মহিলা একটু শান্ত হলেন ! তবে একেবারে না।

—তাই বলে দুম করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বেন ?

—দুম করে আসি নি। আপনার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

—ও তো এক নম্বরের শয়তান। ভালোমন্দর ও কি বোঝে ?

অতনুবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। লজ্জায়, রাগে, দুঃখে ভদ্রলোকের মুখটায় না পাংশু, না রক্তিম একটা অদ্ভুত মিশ্রিত বর্ণচ্ছটা ফুটে উঠেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম, সত্যই এদের দাম্পত্য জীবন বিষময়। নীল কিন্তু এসব ভাববিলাসের ধারে কাছে গেল না। ওর সেই ধীর এবং কঠিন কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করল—সে আপনাদের ব্যাপার। আমি এসেছি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব বলে। আশা করি গুরুত্ব রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন।

মহিলা কটমট করে নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, প্রশ্ন করা হোক। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। আমি ছ্যাঁচড়া চাপিয়ে এসেছি।

—আপনাকে তাড়াতাড়িই ছেড়ে দোব। পাপড়িদেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা ?

—আমি কি জ্যোতিষী না পুলিস যে কে খুন করেছে বলে দোব?

—আপনার অনুমানের কথা জিজ্ঞেস করছি?

—জানি না।

—উনি যখন খুন হন সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—পাপড়ি খুন হবে জানলে আগে থেকে ঠিক করে রাখতুম। এখন মনে পড়ছে না।

—আপনার স্বামী তখন কোথায় ছিলেন?

—ও ইতরের খবর ওকেই জিজ্ঞেস করলে হয়।

—সেদিন উনি নাকি বাড়ি ছিলেন না?

—জানি না।

—পাপড়িদেবী ত আপনাকে খুব ভালোবাসত, তাই না মিসেস লাহিড়ী?

—ছাই বাসত। ভালোবাসলে কেউ বংশের মুখ পুড়িয়ে একটা বেজন্মা ছেলেকে বিয়ে করে? মুখপুড়ী মরেছে, ভালোই হয়েছে। সবাই বেঁচেছে।

—কিন্তু আপনাদের মেয়ে এভাবে মারা গেলেন, তার জন্যে আপনার দুঃখ হচ্ছে না? আপনি চান না তার হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

—দুঃখু যে একদম হচ্ছে না তা নয়। যতই হোক বাড়ির মেয়ে ত। আর যে হতচ্ছাড়া ওকে মেরেছে সেটারও ফাঁসি হওয়া দরকার। তবে এসব ব্যাপারে আমাদের জ্বালাতন না করলেই বাঁচি। কারণ আমরা কেউই তাকে মারি নি। এবার তাহলে আসা হোক। আমার ছ্যাঁচড়া পুড়ে যাচ্ছে। আমি যাব।

—আপনি থাকুন। আমরাই যাচ্ছি।

ঘর থেকে দুজনে বেরিয়ে এলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম মুখরা মহিলার সামনে বেশীক্ষণ থাকতে আমার ভালো লাগছিল না। বেরিয়ে এসে দেখি বারান্দার এক কোণে ঠেস দিয়ে অতনুবাবু

দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা কাছে আসতে ম্লান হেসে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন—দেখলেন ত, এই আমার জীবন। ওপরে যাবেন ত চলে যান। আমার একটু নিচে কাজ আছে।

অতনুবাবু চলে গেলেন। নীল একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল। চল, একবার পাপড়ির ঘরটা দেখে যাই।

তিনতলার সিঁড়ির কাছে এসে ও থমকে দাঁড়াল। বাঁ দিকের দরজা বন্ধ সেই ঘর। কি মনে করে ও এগিয়ে গিয়ে দরজার তালায় নাড়া দিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিনতলায় পাপড়ির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আজ দ্বিতীয় দিন। সে-দিনের থেকে অনেক তফাত। সমস্ত উৎসবের আলো এক ফুঁয়ে কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে। ফুলের ঝাড় টাঙ্গানো হয়েছিল বারান্দায়। সেগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত তিন-তলাটায় এক অদ্ভুত শূন্যতা।

পাপড়ির ঘর লক করা ছিল। ডেড বডি নিয়ে যাবার পর পুলিস ঘরটা লক করে যায়। চাবি না পেলে ঘর খোলা যাবে না। ভাবছিলাম, চাবি ত সিংহীমশাই-এর কাছে। তাহলে নীল এখন কি করবে? হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুতনুবাবু। বললেন—পাপড়ির ঘরে যাবেন? কিন্তু পুলিসের লক করা চাবি ত আমাদের কাছে নেই?

নীল মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে বলল—আমার কাছে চাবি আছে। আপাততঃ সিংহীমশাই এটা আমার জিম্মায় রেখেছেন।

—ও, সরি, বলে সুতনুবাবু বোধ হয় চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নীলের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন।

—সুতনুবাবু, পাপড়ির ঘরের চাবির গোছাটা সেদিন বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিল, তাই না?

—পাপড়ির চাবি হারিয়েছিল নাকি? আমি ত ঠিক বলতে

পারব না।

—আপনি জানতেন না?

—না।

—ঠিক আছে। আমি একটু একলাই ঘরটা দেখে নিচ্ছি। আপনি বরং মালতিকে যদি পারেন একটু পাঠিয়ে দিন।

ঘরের মধ্যে যেখানে যা ছিল সব তেমনিই আছে। কোন পরিবর্তন নেই। এমন কি ফুলের আভরণও তেমন নষ্ট হয় নি। একটু যা শুকিয়েছে। ঘরের অন্য সব আসবাবের থেকেও আজও আবার নীল অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেদিনের থেকে আজ মাছগুলোর মধ্যে একটু বেশী রকমের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। নীল অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, মাছগুলো সব একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে এসে কাচের গায়ে ঠোকর দিচ্ছে।

আমার দিকে না তাকিয়ে নীল বলল—মাছগুলো এ রকম করছে কেন জানিস?

—কি করে বলব? আমি ত মাছের ভাষা জানি না।

—পাপড়ি মারা যাবার পর থেকে ওদের কোন খাবার জোটে নি। দেখবি একটা মজা? বলেই নীল অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে রাখা মাছের খাবারের শিশি থেকে কিছু গুঁড়ো খাবার জলের এক কোণে ছড়িয়ে দিল। দেখা গেল, মাছের ঝাঁক পড়ি-মরি করে ছুটে গিয়ে খাবার খেতে আরম্ভ করেছে। 'বেচারারা' বলে নীল সবে ঘুরেছে, এমন সময় মালতি এসে ঘরে ঢুকল। ওর আজকের সাজটা একটু অন্য রকমের। খুব আট-পৌরে সাজ। গাছকোমর করে পরা একখানা ছাপা শাড়ি। হলুদ রঙা একটা ব্লাউজ। চুলটা টেনে উঁচু করে পিছনে খোঁপা করা। আজ কিন্তু নীল সরাসরি 'তুমি' দিয়েই শুরু করল। বলল—আমাদের নিশ্চয় চিনতে পারছ?

ঘাড় নেড়ে ও হ্যাঁ বলল।

—তাহলে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। কিছু গোপন কোরো না। তাতে তোমার ক্ষতি হবে না।

—জিজ্ঞেস করুন। জানা থাকলে নিশ্চয় উত্তর দোব।

—তোমার দিদিমণির চাবির গোছাটা সেদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে নাকি পাওয়া গেছে? কোথেকে পাওয়া গেছে, জান?

—আমি কিছু শুনিনি।

—তার মানে তুমি চাবির ব্যাপারে কিছুই জান না।

—আজ্ঞে দিদিমণির চাবি, আমি তার কি খোঁজ রাখব?

—বটেই ত। আচ্ছা, ঐ চাবির গোছার মধ্যে আলমারির চাবিও নিশ্চয় আছে?

—আজ্ঞে থাকতে পারে।

—হুঁ। তা চাবিটা কখন থেকে পাওয়া যায় নি তা বোধ হয় জানতে?

—শুনেছিলুম বিয়ের দিন সকাল থেকেই পাওয়া যায় নি।

—তা হলে বিয়ের দিন দিদিমণি গয়নাগাঁটি পরলেন কিভাবে?

—ওটা ছাড়াও আরো এক সেট চাবি দিদিমণির ছিল।

—তোমার দিদিমণির ঘরে সাধারণতঃ কে কে যাতায়াত করত?

—আমি ছাড়া তেমন আর কেউ নয়।

—বেশ। বিয়ের দিনে?

—সেদিন কিন্তু অনেক লোকই ঢুকেছিল। বিয়ে বলে কথা।

—বিয়ের দিন যখন তোমার দিদিমণি শেষবারের মত এ ঘরে ঢোকেন, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—রান্নাঘরে চা তৈরি করছিলুম।

—তখন ঘড়িতে কটা বাজে?

—আজ্ঞে ঠিক তা বলতে পারব না।

—তাহলে ঠিক কি করে বলতে পারলে সেই সময় তুমি রান্নাঘরে

চা তৈরি করছিলে?

—আজ্ঞে সেদিন আমি সারাক্ষণই চা করছিলুম।

—পাকা অ্যালিবাই। তা জানতে পারলে কখন?

— ওপরতলায় যখন হই-চই চেঁচামেচি হল—তখন।

—আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। চেঁচামেচির সময় ছাদের ওপর থেকে কাউকে কি নামতে দেখেছিলে?

—বিয়ের সময় অনেকেই ত ছাদে ওঠানামা করছিল। তবে ছোটদাদাবাবুকে যেন সেই সময় নামতে দেখেছিলুম।

—ছোট দাদাবাবু, মানে সুতনুবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চাবির অন্য গোছাটা এখন কোথায় আছে জান?

—আজ্ঞে সেটা বড় কর্তাবাবুর কাছে থাকে।

—ছাদ থেকে ছোটদাদাবাবু নেমে এসে কি করলেন?

—সটান নিজের ঘরে চলে গেলেন।

—পাপড়িদেবীর ঘরে তখন চেঁচামেচি চলছিল?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! আচ্ছা মালতি, মাছের চৌবাচ্চাটা কে দেখাশুনো করত?

—আজ্ঞে দিদিমণি নিজেই করতেন। ওটা ওঁর বড় শখের জিনিস। কাউকে হাত দিতে দিতেন না।

—তুমি কোনদিন কাউকে ওটায় হাত দিতে দেখেছ?

—না। মনে পড়ে না।

—এ বাড়িতে তুমি কত দিন আছ?

—বছর ছয়েক।

—দিদিমণির সঙ্গে কোনদিন কারো ঝগড়া হয়েছে?

—এই বিয়ের জন্যে ইদানীং হত। আগে কোনদিন শুনি নি?

হঠাৎ নীল একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসল—তুমি বিয়ে করেছ?

এই প্রশ্নে মালতি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর মাথা নিচু করে বলল—হয়েছিল।

—তাহলে ?

—এক বছরের মধ্যেই আমার বর মরে গেছে।

—তার পর থেকেই তুমি এখানে ?

—হ্যাঁ।

—তোমাকে এখানে কে এনেছে ?

—আজ্ঞে ছোট দাদাবাবু।

—দেশ কোথায় তোমার ?

—কোলাঘাট।

—আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তেতলার মুখে সিঁড়ির পাশে যে তালাবন্ধ ঘরটা আছে, ওখানে তোমাদের আর এক কাকীমা থাকেন। তিনি কি একেবারেই মানুষজন চিনতে পারেন না ?

—না।

ওঁকে দেখাশুনো করে কে ?

—কে আবার করবে ? পাগলা হাবলা, নিজের মনেই থাকে। বেশী চেঁচামেচি করলে ঘরে তালা দিয়ে রাখা হয়।

—বিয়ের দিন কি চেঁচামেচি করছিলেন ?

—না। তবে লোকজন আসবে ত, তাই বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

দুম করে নীল অন্য একটা প্রশ্ন করল।

—আচ্ছা মালতি, ধর একগোছা চাবি সকালে মেথর চলে যাবার পর চুরি গেল। তারপর সন্ধ্যেবেলা, বিয়ের হিড়িকে এক সময় চোর গিয়ে সেই চাবি দিয়ে বাথরুমের পেছনের দরজা খুলে চাবিটা কাছা-কাছি কোথাও ফেলে দিল—তাহলে খুনীর নিশ্চয় খুব সুবিধে—তাই না ?

মালতি বোকার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—আজ্ঞে

আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

—হুঁ, বোঝা শক্ত। ঠিক আছে। তুমি এবার যেতে পারো। তোমার ছোটদাদাবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিও।

একটু পরেই সুতনু এলেন। বললেন—কি বুঝলেন মিঃ ব্যানার্জী হত্যাকারী ধরা পড়বে ত?

—পড়া ত উচিত। সময়মত সবই জানতে পারবেন। আজ চলি। অনেক বেলা হয়ে গেল।

সওয়া বারোটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নীল সারাটা পথ গাড়ি চালিয়ে এলো। মাঝ রাস্তায় আমি একবার জিজ্ঞাসা করলাম—কি বুঝলি নীল?

নীল আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—ভাব না একটু।

—দ্যুৎ, এত ফ্যাঁকড়া, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

—তবু ভাব।

আমাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিতে দিতে নীল বলল—কয়েকদিন তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি একটু ব্যস্ত থাকব।

বলেই ও চিলের মত উড়ে চলে গেল।

আমাকে ভাবতে বলে নীল চলে গেল। কিন্তু কি ভাবব? সব ভাবনা-টাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত সব জট-পাকানো আর গণ্ডগোলের ঘটনা রয়েছে যে, কোন একটা বিশেষ সূত্র ধরে ভাবনাটাকে চালাতে পারছি না। ওর এইচ ডাবলু ডাবলু-র এইচ'টার ব্যাখ্যা ত হয়েই গেছে। জানা গেছে কিভাবে খুনটা হয়েছে। কিন্তু কেন? হোয়াই? মোটিভটা কি? সুস্পষ্টভাবে কারো কোন সঠিক মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। আবার আলাদা আলাদা করে ধরলে সকলের ওপরই সন্দেহ বর্তাচ্ছে। আমি ত সন্দেহের তালিকা থেকে কাউকেই বাদ দিতে পারছি না। পাপড়িকে সরিয়ে দিতে পারলে,

অর্থাৎ পাপড়ি না থাকলে লাহিড়ী পরিবারের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভাবে লাভবান হচ্ছে।

স্নান করে খেয়েদেয়ে উঠতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। কড়া শীতের দুপুর। বালিশ শতরঞ্চী আর চাদর নিয়ে সোজা ছাদে চলে গেলাম। অনেকক্ষণ রোদ থাকবে, এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে চাদর গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সিগারেট টানতে টানতে সোজা আকাশের দিকে তাকালাম।

নীল আকাশ। যদিও খুব স্বচ্ছ না। সামান্য ঘোলাটে। দূরে টুকরো সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কনট্রাস্টের মত কয়েকটা কালো চিল এলোমেলো উড়ছে। ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান চিলগুলোকে দেখতে দেখতে মনটা আবার পাপড়ির চিন্তায় ফিরে গেল। ভেতর থেকে কে যেন বারবার জিজ্ঞাসা করছে, কেন, কেন, কেন এই খুন?

বিশ্লেষণটা একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করলাম। পাপড়ি লাহিড়ী। বাংলাদেশের হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে একজন। বিয়ের রাতে তাকে খুন করা হল। কেন?

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের একটা মেয়ের খুন হবার কি কি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে? প্রথমেই আমার মনে হল সম্ভাব্য এবং প্রধান কারণ দুটো। এক প্রেম আর এক অর্থ। একটা প্রেমজাত কারণে প্রতিহিংসা, অন্যটা অর্থকরী লাভালাভি।

পাপড়ির ক্ষেত্রে দুটোই হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে তাকে আর একজন চেয়েছিল। পাপড়ি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্থের ক্ষেত্রে সে এক বিত্তবান পিতার সন্তান। এমন কি রামতনু লাহিড়ীর উইল অনুসারে বিরাট সম্পত্তির অর্ধাংশ তার বা তার স্বামীর প্রাপ্য। যদিও তা অনেক দূরের। অর্থাৎ রামতনুবাবুর মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রশ্ন আসত। কিন্তু একদিন না একদিন তা আসতই। তাই বিয়ের আগেই সরিয়ে দেওয়া। কারণ তার বিয়ের পর সম্পত্তির জন্যে খুন করতে হলে, দুজনকে খুন করতে হবে। তাকে এবং তার

স্বামীকে। খুনী অতটা রিস্ক নিতে রাজী হয় নি। কাজটা তাই আগেই সেরে রাখল।

প্রেম এবং অর্থ ছাড়া আরো এক কারণ আমার মনে উঁকি দিল। বংশমর্যাদা রাখার প্রশ্ন এখানে একটা মারাত্মক দিক। অর্থাৎ পাপড়ি এমনি একজন ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল যাকে লাহিড়ীবাড়ির কেউই পছন্দ করেন নি। প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন তার সঙ্গে বিয়ে না হোক। তার সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানে বংশের মর্যাদাহানি। বিশেষ করে প্রাচীনপন্থী মানুষের মধ্যে বংশ-কৌলিন্য বজায় রাখা একটা মারাত্মক ব্যাধির মত জড়িয়ে আছে।

এই তিনটে কারণকে সামনে রেখে আমি পরিবারের সকলের স্বার্থ এবং হত্যার সম্ভাব্য দিকটা ভাবতে শুরু করলাম।

প্রথমেই ধরা যাক রামতনু লাহিড়ী। তিন নম্বর কারণে তাঁকেও দোষী ভাবতে আমার আপত্তি হল না। হোক আত্মজা, তবু রামতনু বিরক্ত ছিলেন পাপড়ির এই স্বামী মনোনয়নে। তিনি কিছুতেই চান নি পাপড়ি এ বিয়ে করুক। তার জন্যে একদিন মারধোর-এর ঘটনাও ঘটে গেছে। বংশের ঐতিহ্য এবং কৌলিন্য বজায় রাখতে অনমনীয়া, স্বার্থপর এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েকে সরিয়ে দিতে হয়ত কুণ্ঠিত হননি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বা রাজ-রাজড়ার পরিবারে কি এমন ঘটনা কি এর আগে ঘটে নি? ঘটেছে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগই দেখা গেছে নিজের পুত্র বা কন্যাকে যথাসম্ভব দূরে রেখে তাদের প্রেমিক বা প্রেমিকাকে হত্যা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দালককে হত্যা করতে পারলেই রামতনুবাবু বেশী খুশি হতেন। কিন্তু উদ্দালককে হয়ত তিনি সুবিধাজনক আয়ত্তে পান নি। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত এবং শেষ সময়ে নিজের কন্যাকেই খুন করেছেন।

মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র। অনেক সময় এমন এক একটা অঘটন ঘটে, বুদ্ধি এবং সম্ভাব্যতা দিয়ে সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। সত্য প্রায়শঃই কল্পিত কাহিনীর চেয়ে চমকপ্রদ হয়।

পরিস্থিতি এবং মানসিক অবস্থা হয়ত রামতনুবাবুকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে তিনি নিজের মেয়েকে খুন না করে ফিরে আসতে পারেন

অর্থাৎ মোটিভের বিশ্লেষণে রামতনুও খুনী হতে পারেন। কিন্তু যে অভিনব প্রক্রিয়ায় তাকে খুন করা হয়েছে তা কি সম্ভব রামতনুর পক্ষে? ঐ ভাবে খুন করতে গেলে রামতনুকে ডাক্তারী শাস্ত্রে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর ইনট্রাভেনাস ইনজেকশানের দক্ষতাও রাখতে হবে। তবে তা যে একেবারে অসম্ভব, তাও না। এক আলমারি ঠাসা মেডিকেল সায়েন্সের বই। সেখান থেকে খুনের এ তথ্যটুকু যোগাড় করা শক্ত কিছু না। আর ইনজেকশান দেওয়ার কায়দা?

রামতনুবাবুর পিছনের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নেই। হয়ত কোন না কোনভাবে উনি ইনজেকশান দেওয়াটা রপ্ত করেছিলেন। সেটা এখন সুযোগে লাগল।

তারপর—চাবি। খুনের দিন সেটা হারালো। সেদিন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিন সেটা সুদাম বাগান থেকে পেল এবং রামতনুকে ফেরত দিল। চাবিটা যে পাওয়া গেছে সেটা বাড়ির অন্য কোন লোকই জানে না। কি কারণ? কেন রামতনুবাবু চাবির ব্যাপারটা কাউকে জানালেন না? এটাও যে একটা ধন্দ।

মোটা কথা, রামতনু লাহিড়ীকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। এর পরই যার ওপর সন্দেহ আসে সে হচ্ছে সুতনু লাহিড়ী। রামতনু লাহিড়ীর ছেলে। মোটিভের দিক থেকে বিচার করলে সুতনুও হত্যাকারী হতে পারে। পাপড়ির মৃত্যুতে সব থেকে লাভবান হচ্ছে সুতনু। বিশাল সম্পত্তির পুরো মালিকানা। কলকাতা শহরে অত বড় বাড়ি। এ ছাড়াও আরো কিছু বাড়ি-টাড়ি আছে। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। তার ওপর বড়বাজারে বিরাট এবং নামকরা রানিং হার্ডওয়্যার ব্যবসা। পাপড়ি না থাকলে সবটাই ওর। পাপড়ির

বিয়ে না হলে অবশ্য ততটা ভাবত না সুতনু। কিন্তু বিয়ের পর সব কিছুর ওপর অংশীদারী বর্তাবে সম্পূর্ণ এক অবাঞ্ছিত বাইরের লোকের। সেটা মেনে নেওয়া বোধ হয় সম্ভব হয়নি সুতনুর পক্ষে। তাই ঠিক বিয়ের আগেই সে খুন করার ঝুঁকি নিয়েছে। আর রামতনু-বাবুর পক্ষে যদি ঐভাবে খুন করা সম্ভব হতে পারে, সুতনুর পক্ষেও তা সম্ভব।

তৃতীয় ব্যক্তি অতনু লাহিড়ী। অতনু লাহিড়ীর মোটিভটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওর লাভটা কি? না টাকা-পয়সা, না প্রেম। অবশ্য বংশমর্যাদার একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু যেখানে মেয়ের বাবাই বিয়েতে মত দিয়ে দিয়েছেন, সেখানে কাকা হিসেবে সে কি-ই বা করতে পারে? বংশমর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল তার একার না।

অবশ্য অন্য ধরনের একটা রাগ থেকে সে পাপড়িকে হত্যা করতে পারে। যদিও যুক্তিটা খুব জোরালো না, তবু একটা পয়েন্ট হলেও হতে পারে।

অত বড় বংশের ছেলে হয়েও সে পৈত্রিক সম্পত্তি তেমন কিছু ভোগ করতে পারে নি। যে বাড়িতে বা দোকানে তারও ভাগ থাকা উচিত ছিল তার কিছুরই সে ভাগীদার নয়। অবশ্য রামতনুবাবুর কথামত তার প্রাপ্য অংশের মূল্য বাবদ সে প্রচুর টাকাপয়সা নাকি রামতনুবাবুর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। এবং সে সব টাকাকড়িও কম না। গেল কোথায়? অত বড় ঠাট-ঠমকের বাড়িতে নিতান্ত দুরবস্থায় সে পড়ে আছে। ঘরদোর দেখে মনে হয় তার অবস্থা খুব ভালো না। রোজগারপাতি যে খুব ভালো তাও মনে হয় না।

এর মানে কি ধরে নিতে হবে যে, পাপড়ি না থাকলে সেই অংশের কিছুটা অনুগ্রহ করে রামতনু তাকে দিয়ে যাবেন, এই ভেবে সে পাপড়িকে খুন করেছে? উহুঁ! বড় বেশী কষ্টকল্পনা এবং অতিরিক্ত ভাবনা হয়ে যাচ্ছে। এই মোটিভ থাকলে তার দুজনকে খুন করতে

হয়। সুতনু আর পাপড়ি। কিন্তু যেহেতু সুতনু এখনও বেঁচে আছে, তাই অতনু সম্বন্ধে অতটা চিন্তা না করলেও চলে। তার ওপর শোনা গেল তিনি আইন পড়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ডাক্তারী বই ঘেঁটে ঐভাবে খুন করার কথা ভাবা কি সম্ভব? ইঞ্জেকশান দিতে পারার কথাও চিন্তা করতে হবে। যে লোকটা সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে, বাড়িতে যার অশান্তির আগুন জ্বলছে, তার পক্ষে এত সুস্থ মাথায়, এত ধৈর্য ধরে খুন করা কি সম্ভব?

অবশ্য খুন করার সুযোগ ওঁরই সবথেকে বেশী। পাপড়ির ঠিক নিচের তলার ঘরটিই ওঁর ঘর। এটাচড বাথের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পাপড়ির ঘরে যাওয়া ওর পক্ষে সব থেকে সুবিধার। তার ওপর তিনি সারাদিন বাড়িতে ছিলেন না, এটাই জনশ্রুতি। এবং এই অ্যালিবাই-এর অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সেই অবসরে সবার অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পাপড়িকে খুন করা অসম্ভব নয়।

তবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, আরো দু'-একজনের সাহায্য এই খুনের অন্তরালে রয়েছে: মেথর চলে যাবার পর খিড়কির দরজা সুদাম বন্ধ করে দেয়। সেদিনও, নীলের কথামত দরজা বন্ধ হয়েছিল, একজন সেই চাবি চুরি করেছিল এবং খুনীকে পরে সেই দরজা খুলে দিয়েছিল। খুনী যেই হোক, খুনের অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি এক ঘণ্টা আগে বাইরে থেকে এসে গাছতলায় অপেক্ষা করেছিল এবং সে অন্তত তিনটে সিগারেট খেয়েছিল। সে যাই হোক, আরো একজন খুনীকে চেনে। হয় সুদাম, নয় মালতি। আমার মনে হয়, ওদের চাপ দিলে বা ভয় দেখালে খুনীর নামটা জানা যেতে পারে। নীলকে বলতে হবে কথাটা।

এর পরই ডাঃ অরিন্দম বসু। মোটিভ একটাই। জেলাসি। পাপড়িকে সে চেয়েছিল। পায় নি। এবং শাসিয়েছিল, কিছুতেই সে উদ্দালকের সঙ্গে বিয়ে হতে দেবে না। অবশ্য উদ্দালককেও সে খুন করতে পারত। কিন্তু তাতে করেও অন্যমনা পাপড়ির মনটা

সে কোনদিনও পেতো না, এটা ভালো করেই বুঝেছিল। এবং তাই বিয়ে করে সে উদ্দালকের ঘরণী হয়েছে, এটা দেখতেও তার বুক জ্বলে যেত। 'রাজভোগ আমি পাব না, তাই তোকেও খেতে দেব না'—এই মনোভাব নিয়েই তার কাছে বিষফলের মত পাপড়িকেই সে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে। আর এই ধরনের খুন করার সব থেকে দক্ষতা একমাত্র তারই।

মেয়েদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মালবিকাদেবী, শর্মিষ্ঠাদেবী বা মালতি—এদের ইচ্ছে থাকলে ঐ প্রক্রিয়ায় খুন করার অসুবিধা আছে। অবশ্য এদের মধ্যে যদি কেউ অতীতে নার্সিং শিখে থাকে তা হলে আলাদা কথা।

শর্মিষ্ঠাদেবী বাংলায় এম. এ.। মালবিকা দেবী লেখাপড়া শিখেছেন বলে মনে হয় না। আর মালতি! ও যে ঠিক কি বোঝা যাচ্ছে না। শিক্ষিতা না অশিক্ষিতা, কথাবার্তার ধরন দেখে বোঝা যায় না। চালচলনেও না। ঝিগিরিটা ওর সত্যিকারের পেশা না অভিনয়, তাও বুঝতে পারি নি। আসলে ও আমার কাছে এক রহস্য। ও বাড়িতে একজন পাগল মহিলা আছেন। যদিও তাঁকে চোখে দেখি নি, তবু সত্যিই কি তিনি পাগল--না ভান? পাগলের সাত খুন মাপ—ব্যাপারটা কি সেই রকম? কে জানে? তবে মেয়েদের এ ব্যাপারে কারো না কারো হাত থাকলেও থাকতে পারে।

উদ্দালকের খুন করার কোন প্রশ্ন আসছে না। তার অ্যালিবাই জোরালো। সে তখন স্পটে ছিল না। তার মা অনিন্দিতাদেবী অনেক দূরে। সে মহিলার খুনের কোন মোটিভই পাচ্ছি না।

অর্থাৎ কে যে খুনী তা আমার চিন্তার ধারে কাছে আসতে পারছে না। আমার কাছে সবাই খুনী, আবার কেউ না। বড় জট পাকানো ব্যাপার।

ওদিকে আরো কয়েকটা ঘটনা রহস্যটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। প্রথমতঃ ও বাড়িতে তিনজন পুরুষই সিগারেট খায়।

কিন্তু সে কোন্ লোক যে কাটা রাংতা না ফেলে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট ব্যবহার করতে অভ্যস্ত? সেদিন তো কাউকেই সিগারেট খেতে দেখা গেল না।

দ্বিতীয়তঃ, চাবির ব্যাপারটা সত্যিই বেশ ঘোরালো। নীল মালতিকে যা বলল তাই কি সত্যি? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয়তঃ, অ্যাকোয়ারিয়ামটা এলোমেলো হয়েছিল কেন? অ্যাকোয়ারিয়াম-এর বালি সরানো ছিল কি জন্যে?

আর সর্বশেষ, মোটামুটি সম্ভ্রান্ত একটা পরিবারে মালবিকাদেবীর মত মুখরা মহিলা কিভাবে বৌ হয়ে আসতে পারে তাও রহস্য।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। জোর ধাক্কায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর নীল সামিয়ানাটা তুলে নিয়ে কে যেন কালো পর্দা ফেলে দিয়েছে। মাঘের সন্ধ্যে সারা ছাদটাকে অন্ধকার আর কুয়াশা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। শীতও করছে খুব। একটা চাদরে কি এই শীত যায়?

—তোর কি বোধশক্তিও চলে গেছে দাদা? এই শীতের মধ্যে পাতলা চাদর জড়িয়ে মোষের মত ঘুমচ্ছিস? ভাগ্যিস ছাদে এসেছিলাম। নইলে ত সারারাত ঐখানেই পড়ে থাকতিস।

রেখার চিৎকারে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। কে জানে, আবার ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগল কিনা?

সেদিন সন্ধ্যের হিম লাগার জন্যেই হোক অথবা যে কোন কারণেই পাঁচ দিন বাড়িতে আটকে পড়লাম। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর তার সঙ্গে সর্দিজ্বর। ইচ্ছে থাকলেও বাইরে বেরুতে পারলাম না। মাথার ওপর আমার একজন কড়া অভিভাবক আছে এখানে। দেশে আমার বৃদ্ধ বাবা মা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন নন। কারণ ওঁরা জানেন, এখানে রেখা নামে একটি কড়া ধাঁচের পিসতুতো বোন আছে, যার

: শাসন এড়িয়ে বখে যাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যদিও রেখা আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, তবুও ওর আদরের শাসনটা আমার বরাবরই ভালো লাগে। অনেক সময় শাসনটা উপভোগ করার জন্যে ইচ্ছে করেই ওকে রাগিয়ে দিই। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল ওর মুখ থেকে অভিভাবকসুলভ ধমকানি।

এই পাঁচ দিন জ্বরের মধ্যে সেই সব ধমকানির তিলমাত্র বিরতি ছিল না। যেমন বকুনি তেমনি আদর। ওষুধ পথ্য থেকে আরম্ভ করে সেবাশুশ্রূষা। কোনটারই কোন খামতি ছিল না। কিন্তু ছ' দিনের দিন আর ও আমাকে আটকে রাখতে পারল না। মাথার মধ্যে পাপড়ি পোকা সর্দিজ্বরের সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে উঠেছে। জ্বরের মধ্যেও ভালো করে ঘুম আসে নি। কেবল ভেবেছি মেয়েটাকে কে খুন করতে পারে? কিন্তু কোন কূল-কিনারা চোখে পড়েনি।

এদিকে নীলেরও কোন পাত্তা নেই। সেই যে সেদিন দুপুরে ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালালো, এর মধ্যে আর একদিনও এ পথ মাড়ায় নি। অন্য সময় হলে আমার সঙ্গে এত দিন দেখা না হওয়ার জন্যে এসে হাজির হত। আমি জানি ও এখন খুব ব্যস্ত। বোধ হয় ও এতদিনে অনেক এগিয়ে গেছে। আমার কাছে এখনও যা তমসাচ্ছন্ন, ও নিশ্চয় সেখান থেকে আলোর রশ্মি খুঁজে পেয়েছে। নিঃসন্দেহে আমার থেকে ওর চিন্তার পদ্ধতি আলাদা। চিন্তা করতে ও জানে। চিন্তার সু-ফসলটুকুও নানান বাধার মধ্যে থেকে ঠিক তুলে আনতে পারে।

নিজের ঘরে বন্দী থাকতে থাকতে আমি ছটফট করে উঠলাম। কোন রকমে রেখাকে ম্যানেজ-ট্যানেজ করে বেরিয়ে পড়লাম। আজ যেমন করেই হোক নীলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

চারটে নাগাদ ওর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল হয়ত ওর সঙ্গে আজ দেখা নাও হতে পারে। হয়ত কোথাও বেরিয়ে গেছে। কিংবা কারো পিছন পিছন কোথাও ছুটছে।

কিন্তু একতলার বৈঠকখানাতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ও একা ছিল না। আমার অপরিচিত এক যুবক দরজার দিকে পিছন ফিরে নীলের সামনাসামনি বসে ছিল। আমাকে দেখে ও ইশারায় পাশে বসতে বলল। সামনে গিয়ে বসেই যুবকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। পিছন থেকে তাকে অপরিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু একেবারে আমার অপরিচিত না। চিনতে পারলাম। যদিও এর আগে মাত্র একবারই তাকে দেখেছিলাম। উদ্দালক মিত্র।

ওরা যেন কি সব কথাবার্তা বলছিল। আমি যাওয়াতে সেটা থেমে গেল। নীল পরিচয় করিয়ে দিল—মিঃ মিত্র, এর সামনে আপনি সব কথাই বলতে পারেন। ও আমার বিশেষ বন্ধু।

উদ্দালক ম্লান হেসে বলল—অজেয় বসু? তাই না?

আমি বললাম—সে কি, আপনি আমার নামও জানেন দেখছি।

—জেনে ফেলেছি। আপনার বন্ধুই একটু আগে আপনার কথা বলছিলেন। এছাড়াও আপনার আর একটা পরিচয় আমার জানা আছে। অবশ্য তখন জানা ছিল না আপনারা দুজন একই লোক। পৌরাণিক প্রেমের ওপর আপনার লেখা বইটা বাজারে বেশ নাম করেছে। গত জন্মদিনে পাপড়িকে ঐ বইটা প্রেজেন্ট করেছিলাম।

পাপড়ির স্মৃতি মনে আসতেই উদ্দালকবাবুর মুখের রেখাগুলো কেমন যেন ধীরে ধীরে পালটে যেতে লাগল। এক করুণ বিষণ্ণতা স্নিগ্ধ প্রকৃতির গায়ে কুয়াশার ছায়া হয়ে ছড়িয়ে গেল। উজ্জ্বল ভাসা ভাসা চোখ দুটোয় অন্যমনস্কতা নেমে এল। আমি আর নীল, উভয়েই সেটা বুঝলাম। কথায় বাধা দিয়ে নীল এই ছোট্ট অন্যমনস্কতা ভাঙ্গিয়ে দিতে চাইল না। প্রায় নীরবে লাইটার জ্বালিয়ে ও একটা সিগারেট ধরাল। এই অবসরে উদ্দালকবাবুকে আমি আপাদমস্তক লক্ষ্য করলাম। আজ ওকে দেখে আমার বারবার কেমন মনে হচ্ছে, এই রকম একটা মুখ আমি যেন এর আগে কোথায় দেখেছি, বিয়ের বাসরে না অন্য কোথাও কিছুতেই খেয়াল করতে

পারছি না। কিন্তু বড় চেনা মুখ।

বিয়ের সাজে সাজা বরকে ঠিক আটপৌরে মানুষ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফোঁটা-চন্দন আর টোপরে আসল মানুষটা তখন অন্য রকম হয়ে যায়। বিয়ের দিন যে উদ্দালকবাবুকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে আজকের এই যুবকের বেশ কিছুটা তফাৎ হয়ে গেছে। গরদের পাঞ্জাবি, ধুতি আর ফুলের মালায় পরিচিত একটা রূপই চোখের সামনে ভাসে। সেটা আদি অকৃত্রিম বর। সনাতন নিয়মে বিয়ে করতে যাওয়া একজন পুরুষ। তখন তার আলাদা এবং নিজস্ব সত্তাটা চিরাচরিত বরেদের দলে মিশে হারিয়ে যায়। তা ছাড়া আমি যখন উদ্দালককে দেখেছিলাম তখন তাকে কি রকম উদ্‌ভ্রান্ত আর সর্বহারা মনে হচ্ছিল। একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আর সব হারানোর বৈরাগ্য তাকে ঘিরে রেখেছিল।

আজ, যদিও সেদিনের তুলনায় অনেক স্বাভাবিক মনে হল, তবু ওর বিশাল বিষণ্ণ চোখে সংসার বৈরাগ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

উদ্দালককে দেখতে সুন্দর। এক কথায় রূপবান। এমন সুপুরুষ ছেলে না হলে পাপড়ির সঙ্গে মানায় না। একমাথা তার কোঁচকানো কালো চুল। উজ্জ্বল ভাসা ভাসা দুটো চোখ। চাহনীতে কোথায় যেন একটা কোমল মায়া জড়িয়ে আছে। বোধহয় এক লহমায় ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পারে, ওর মধ্যে কোন ক্রুরতা নেই। কোন শঠতা করতে বোধ হয় ও শেখে নি। দীর্ঘ ধারালো নাক। ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁট। আর সমস্ত মুখে সকল সারল্য বজায় রেখে এক পুরুষ ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে দিয়েছে ওর উন্নত আর দৃঢ় চিবুক। প্রায় পাঁচ ফুট ন ইঞ্চির মত লম্বা। দোহারা গড়ন। গায়ের রং মাঝারি।

আসলে এই সব কিছু নিয়ে আমার ওকে দারুণ ভালো লেগে গেল। ওকে দেখতে দেখতে একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে কেবলি পাক খেতে লাগল। ওকে যেন কোথায় দেখেছি। কিংবা ওরই মত কাউকে। কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারলাম

না। অথবা আমার ভুলও হতে পারে। আসলে ছোটবেলায় মা মাসীদের মুখে যে ধরনের রূপটুপ থাকলে একজন পুরুষকে সুন্দর বলা যায়, সেই রকম একটা ইমেজ তৈরী হয়ে ছিল মনের মধ্যে। উদ্দালককে দেখে হয়ত অবচেতন সেই ইমেজটা কথা বলে উঠেছে।

প্রায় মিনিট খানেক অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ উদ্দালক একটু নড়ে চড়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে বলল—ইফ য়ু ডোণ্ট মাইণ্ড।

নীল ব্যস্ত হয়ে বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ আবার একটা কথা হল নাকি?

সিগারেটের প্যাকেটটা হাতের ওপর তুলে ধরল। রয়েল সাইজ ফিল্টার উইলস্। একটু খটকা লাগল। পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আমি ঠিক দেখছি, না ভুল? উদ্দালকবাবু সিগারেটের প্যাকেট খুলতেই দেখলাম কাটা রাংতা ফেলে দেওয়া নেই।

রাংতাটা সরিয়ে একটা সিগারেট বার করে ফের রাংতাটা যথা-স্থানে রেখে প্যাকেট বন্ধ করে দিল। চকিতে আমি নীলের দিকে তাকালাম। নীলও আমার দিকে। কিন্তু নীল নির্বিকার। ওর মুখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই। একটু পরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীলই বলে উঠল—উদ্দালকবাবু, আপনি কিন্তু এখনও বলেন নি আজ হঠাৎ আমার কাছে কেন এলেন?

—বলছি। এই বলে একটু থেমে ঠিক আগের মত অন্য-মনস্কের সুরে বলতে শুরু করলেন—প্রথমে আমি ইনস্পেক্টর সরল সিংহের কাছেই যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম, পুলিসের পক্ষ থেকে প্রাইভেটলি আপনিই এই কেসটা ডীল করছেন তখন আপনার কাছে আসাই শ্রেয়ঃ মনে হল।

বাধা দিয়ে নীল বলল—কেন? আমার কাছে আসা আপনার শ্রেয়ঃ বলে মনে হল কেন?

—মিঃ সিংহকে আমার প্রথম দিনই ভালো লাগে নি। ওনার

স্বভাব বা ব্যবহার আমার খুব রুড মনে হয়েছিল। ডাক্তার উকিল আর পুলিস, এঁরা যদি সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করেন তাহলে মানুষ তাঁদের ওপর নিজেদের আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। আর সত্যি বলতে কি পুলিস-টুলিস আমার একদম ভালো লাগে না। জীবনে কোন দিনও থানায় যাবার কথা চিন্তা করি নি। থানার ফুটপাথ থেকে যতদূর সম্ভব দূর রাস্তায় চলাফেরা করতাম। অথচ ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে আজ আমাকেই চিন্তা করতে হচ্ছে পুলিসের কাছে যাবার কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনলাম কেসটা আপনার হাতে এসেছে, আপনার সেদিনের ব্যবহার আমার মনে আছে, তাই—

নীল বাধা দিল—ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার বলুন, কেন এলেন ?

উদ্দালক আমাদের থেকে বয়সে ছোটই হবে। মনে হয় ও এখনও ত্রিশ পার হয় নি। তবু একেবারে ছেলেমানুষ না। যদিও ওর মুখের মধ্যে ছেলেমানুষী সারল্য লুকিয়ে আছে। সেই সরল আবেগটা ফুটে উঠল ওর কথার মধ্যে—ছোটবেলায় কোন এক রূপ-কথার গল্পে পড়েছিলাম, এক রাজপুত্র সব হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় মনের দুঃখে বনে চলে গেল। সব হারালে যে কি ব্যথা লাগে তা গল্প পড়ে সেদিন উপলব্ধি করতে পারিনি। আজ পারছি, বিশ্বাস করুন নীলাঞ্জনদা।

নীলকে সরাসরি দাদা সম্বোধন করে বসল। কিন্তু আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে কথা পরে। উদ্দালকের কথায় ফিরে আসি। ও তখনও বলে চলেছে—আমি এখনও ভাবতে পারছি না, পাপড়ি নেই। পাপড়ি আর কোনদিনও আমার কাছে ফিরে আসবে না। আর কোনদিন ও আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না আমার চরম দুঃখের দিনে। একটা খেইহারা নৌকোয় চেপে জীবনের নদীতে পাড়ি দিয়েছি। ছোট থেকেই কেউ আমার পাশে নেই। মাঝে মাঝে বড়

সঙ্গহীন মনে হয়েছে নিজেকে। অসহায়ের মত মাঠে ময়দানে অথবা শহরের হাজার ভিড়ে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি। ছোটবেলায় আমার বেশ মনে পড়ে, একটা মিশনারী স্কুলে পড়তাম—

হঠাৎ ও থেমে গেল। তারপর বলল—আপনি বোধ হয় বোর ফিল করছেন!

—না, একদম না। আপনি বলুন।

—'আপনি' করে না, আমি আপনাকে দাদা বলে ডেকেছি।

একটু হেসে নীল বলল—বেশ তাই হবে। বল, কি বলছিলে। থেমো না। কিছু গোপন না করে সব খুলে বল।

—বলছি। বলব বলেই ত এসেছি আপনার কাছে। যাকে সব বলতে পারতাম সে ত আর কোনদিন আমার কথা শুনতে আসবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলতে শুরু করল—একটা মিশনারী স্কুলে পড়তাম। পড়াশুনায় কোনদিনও খারাপ ছিলাম না। কিন্তু সব থেকে খারাপ লাগত কি জানেন, যখন দেখতাম প্রতিদিনই আমারই মত সব ছোট ছোট ছেলেদের মায়েরা টিফিনে এসে তাদের আদর করে যত্ন করে মাথায় হাত বুলিয়ে খাইয়ে যেতেন। কোনদিন কিন্তু আমার জন্যে কেউ আসে নি। আসত না। সীমাদি, মানে আমাদের সেই সময়ের আয়া টিফিন সাজিয়ে সুটকেসে ভরে দিতেন।

কোনোদিনও খেতাম না সে সব। খেতে ইচ্ছেও করত না। স্কুল বাড়ির সামনে প্রতিদিন টিফিনের সময় একটা কুকুর ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঠিক আমার কাছে এসে দাঁড়াতো। আর আমি সবাইকে আড়াল করে তাকে সব খাইয়ে দিতাম। কুকুরটা আমার ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় আদরের মর্ম জন্তুরাও বোঝে। খাবার-গুলো তখন কেন যে খাইয়ে দিতাম তা আজ বুঝতে পারি। বোধ হয় আমিও চাইতাম, সবার মত আমার মাও আমাকে আদর করে খাইয়ে দেন।

বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলে দেখতাম, বন্ধুদের মায়েরা তাদের ছেলেদের কেউ বা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন, কেউ বা ধমক দিচ্ছেন। আমার মা আমাকে কোনদিন ধমকও দেন নি, আদরও করেন নি।

কথার মাঝে নীল বলল—কিন্তু তুমি ত মায়ের কাছেই থাকতে?

—হ্যাঁ, মায়ের বাড়িতে থাকতাম। মায়ের কাছে না। পাস করে রেজাল্ট নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকতাম, মা এলে রেজাল্ট দেখাব। আমার মা ফিরে এসে আর সব ছেলেদের মায়ের মতো আমাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরবেন এই আশায়। কিন্তু বাংলা বম্বের নামকরা সেরা অভিনেত্রী। তাঁর সময় কোথায় ছেলের রেজাল্ট দেখার। তবে আমার কিন্তু কোনদিনও খাওয়া-পরা আর শিক্ষার অভাব হয় নি। বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলের এগুলো থাকে না, কিন্তু মা থাকে। আমার সব ছিল কিন্তু মা ছিল না। জানেন, আজও আমি এই বয়সে অন্ধকার রাতে ছাদের ওপর একা একা পায়চারি করি—আর বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় একটা কান্নাজড়ানো শব্দ 'মা'। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অভিশপ্ত মনে হয়। এ জীবনে কোনদিনও মা বলে ডাকতে পারলাম না। মা সামনে এসে দাঁড়ালে বিশ্বজোড়া অভিমান গলায় আটকে 'মা' ডাকা বন্ধ করে দেয়।

—কিন্তু তোমার বাবা?

—বাবা? ঠোঁটের কোণে শ্লেষ ফুটে উঠল,—আমি কোনদিন সে ভদ্রলোককে চোখেই দেখিনি।

—তিনি বেঁচে আছেন?

—জানি না।

—সে কি! তোমার মায়ের কাছ থেকে কোনদিন জানতে চাও নি?

—চেয়েছিলাম। উত্তরে উনি বলেছিলেন, ধরে নাও তোমার

বাবা মরে গেছে। কোন লম্পট দুশ্চরিত্র এবং বেইমান কোনদিন এসে তার ছেলে বলে তোমাকে দাবী করলে, আমার আয়রনচেস্টে রিভলবার আছে, সোজাসুজি তাকে গুলি করবে। এর বেশী আর কিছুই বলেন নি। আমার মার জীবনে যতই কলঙ্ক থাক না কেন, তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালিনী। মুখের ওপর মুখ তুলে কথা বলতে আমি কোনদিনও পারিনি।

—তোমার বাবার নামটা নিশ্চয়ই জান?

—জানি। সুরঞ্জন মিত্র।

—আগে কোথায় থাকতেন, জানতে পার নি?

—না। এ পৃথিবীতে একমাত্র যিনি তাঁকে চেনেন বা জানেন, সেই মা-ই তো আমার কাছে নীরব।

—বেশ। তারপর কি হল বল?

—খেইহারা নৌকোটা যখন দরিয়ায় একা একা ভাসছে, দেখা হয়ে গেল একদিন পাপড়ি নামের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। সত্যিই ও ছিল যেন ফুলের একটা পাপড়ি। যে ওর নাম রেখেছিল পাপড়ি তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

—বাই দ্য বাই, পাপড়ির সঙ্গে তোমার আলাপ হয় কেমন করে?

—আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন, আমি একটু গাইতে টাইতে পারি। পণ্ডিত রামকিঙ্কর সেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যাঁর নাম অনেকেই মনে রাখবেন, বিশেষ করে ধ্রুপদ আর ধামারে, আমি তাঁর কাছেই গান শিখি। একদিন পাপড়ি এল ওঁর কাছে গান শিখতে, আমাদের আলাপ হল। হল পরিচয়। তারপর একদিন দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসলাম। বিশ্বাস করুন নীলাঞ্জনদা, জীবনে আমার সব না পাওয়ার দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম ও আমার পাশে এসেছিল বলে।

—একটা কথা উদ্দালক, ও কি তোমার সব পরিচয় জেনেছিল?

—আমি কোন কথাই ওর কাছে লুকোইনি। লুকোব কেন বলুন? ও ছাড়া আপন বলে তো আর কাউকে আমার জীবনে পাই

নি। সত্যিকারের ভালোবাসা আমি ওর কাছেই পেয়েছিলাম। এক একসময় যখন আমি পিছনের জীবনের গ্লানিতে ভেঙে পড়তাম, যখন নিজেকে জগতের একটা অপাংক্তেয় জীব বলে মনে হত, পাপড়ি তখন আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে আমার কল্পনার মায়ের মতো আমাকে আদর করে বলত, 'মনে রেখো এখন আর তুমি একা নও। আমি আছি তোমার পাশে, সারাজীবন।'

হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল উদ্দালক। আমি ভাবতেই পারিনি প্রায় অপরিচিত ২জন মানুষের কাছে ও এইভাবে ভেঙে পড়বে। বড় অস্বস্তি লাগছিল। আবেগ বড় ছোঁয়াচে রোগ। আশপাশের সবাইকে বুঝি পেয়ে বসে। আমিও বড় বেশী আবেগপ্রবণ, আমার সেই মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল কান্নায় ভেঙে পড়া উদ্দালককে বুকে টেনে নিয়ে বলতে আজ থেকে তুই আমাদের ভাই হলি। আর কিছু ভাবিস না তুই।

নীলের দিকে তাকালাম। এমনিতে ও খুব শক্ত মনের ছেলে। এ রকম সেন্টিমেণ্টাল মুহূর্ত ওর জীবনে এর আগে আসে নি। তাই দেখবার ছিল এখন ও কি করে। কিন্তু আশ্চর্য, নীল কিছুই করল না। চুপ করে বসে নির্বিকার সিগারেট টেনে চলল।

একটু পরে, কান্নার বেগ থামলে উদ্দালক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে একটু সহজ হয়ে বলল—সরি, এক্স্ট্রিমলি সরি নীলাঞ্জনদা, মাঝে মাঝে আমি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যাই। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না পাপড়ির কথা আর ভেবে কোন লাভ নেই। আর কোনদিন পাপড়ি পাশে এসে বলবে না সে আমার পাশে আছে চিরজীবন। আমি সত্যিই সর্বস্বান্ত।

নীল যে কোথা থেকে এই অল্প বয়সে সান্ত্বনা দেবার মতো ব্যক্তিত্ব খুঁজে পায়, আমি জানি না। যা করতে গেলে আমাকে উদ্দালকের মতো কেঁদে-টেঁদে করতে হত, অন্ততঃ চোখে জল-টল এসে যেত, নীল অদ্ভুত গম্ভীর স্বরে মাত্র কয়েকটা কথায় বলে দিল—না উদ্দালক, এ

পৃথিবীতে নিজেকে কখনোই একা ভেবো না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখ। কেউ না কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবেই। দাঁড়াতে হবেই। জগতের তাই নিয়ম। একটু আগে আমাকে দাদা বললে না? এবার বলো ত, কেন তুমি আমার কাছে এসেছ?

নিমেষে উদ্দালক ওর সব দুর্বলতা কাটিয়ে বলে উঠল—পাপড়ি চলে যাবার পর আমি মরতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু মরতে পারি নি। এক সপ্তাহ আমার কিভাবে কেটেছে আমি নিজেই জানি না। কিন্তু হঠাৎ গতরাত্রে আমার মনে হল, কাওয়ার্ডের মতো মরার কোন মানে হয় না। অন্ততঃ যে আমার জীবনের শেষ শান্তিটা কেড়ে নিয়েছে তাকে আমি ছাড়ব না। আমি চাই তার চরম শাস্তি। আর এটা যদি করতে না পারি পাপড়ি আমাকে ক্ষমা করবে না। নীলাঞ্জনদা, তাই আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। পাপড়ির হত্যা-কারীকে আপনি খুঁজে বার করুন।

নীল একটু হাসল—তা এর জন্যে তোমার না এলেও চলত। কারণ খুনীকে আমি খুঁজে বার করবই। তবে এ একদিকে ভালোই হল। তুমি নিজে আমার কাছে না এলেও আমাকেই তোমার কাছে যেতে হত। আমাকে কয়েকটা খবর দিতে পার উদ্দালক।

—বলুন। জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

নীলের গলার স্বর পালটে গেল। ঘরোয়া নীল নিমেষে গেল হারিয়ে। শুরু হল পুলিসী সওয়াল—এই ব্র্যাণ্ডের সিগারেট তুমি কত দিন খাচ্ছ উদ্দালক?

—সিগারেট আমি বেশী দিন ধরিনি, বোধ হয় বছর পাঁচেক। আর তখন থেকেই এই ব্র্যাণ্ডটাই খাই।

—বরাবরই তুমি রাংতাটা শেষ পর্যন্ত রেখে দাও?

অবাক হয়ে উদ্দালক বলল—হ্যাঁ, বরাবরই।

—বিয়ের দিন তুমি সারাদিন কি করেছিলে মনে আছে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। সারাদিন আমি বাড়িতেই ছিলাম।

—কখন বেরিয়েছিলে ?

—তা ধরুন সাতটা নাগাদ। আমার বাড়ি থেকে পাপড়ির বাড়ি যেতে বড় জোর আধ ঘণ্টা।

—তোমার বাড়িটা যেন কোথায় ?

—তারক দত্ত রোড।

—সেটা কোথায় ?

—সৈয়দ আমির আলি অ্যাভেন্যুর কাছে।

—সাতটার আগে ? তারপরে নিশ্চয় নয়।

—না। কারণ পঞ্জিকা মতে ঐটাই নাকি শুভ সময়। কি শুভ সময় দেখলেনই তো।

—তোমার সঙ্গে কে কে গিয়েছিলেন ? আই মীন বরযাত্রী।

—তেমন বিশেষ কেউ নয়। আমার পুরনো কয়েকজন কলেজের বন্ধু, ওরা অবশ্য কমন ফ্রেণ্ড। আমার আর পাপড়ির।

—তোমার মা কি সেদিন সারাদিনই বাড়ি ছিলেন ?

—প্রায় বছর তুয়েক আর মার সঙ্গে থাকি না।

—কেন ?

—মাকে বলেছিলাম, তাঁর ঐ প্রোফেসান আমার ভালো লাগে না, ওটা ছেড়ে দিতে। দেন নি ; তাই।

—উনি এই প্রোফেসানটা ছাড়ছেন না কেন, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে ?

—অর্থ আর যশের মোহ মানুষ বোধ হয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছাড়তে পারে না।

—তোমাদের এই বিয়েতে তোমার মায়ের মত ছিল ?

—আপত্তি ছিল না।

—আগ্রহ ?

—তেমন একটা না। কারণ বেশী বড় বনেদী মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা ওঁর ইচ্ছে ছিল না। তবে মত দিয়েছিলেন পাপড়ির জন্যে।

—উনি সেদিন তোমার বাড়িতে আসেন নি।

—হ্যাঁ। এবং প্রায় সারাদিনই ছিলেন।

—তার মানে তুমি সন্ধ্যেবেলা যখন বিয়ে করতে বের হও তখন উনি ছিলেন না?

—উনি পাঁচটা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন।

—এ রকমটা হওয়ার কারণ কিছু জান?

—আমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে যেতে ওনার আপত্তি।

—কেন?

—মনে হয় কোন কমপ্লেক্স।

—তোমার বন্ধুরা কখন এসেছিল?

—বেশীর ভাগই পৌনে সাতটা নাগাদ। অবশ্য সাতটার মধ্যেই সবাই এসে গিয়েছিল। তবে—

—তবে কি?

—সুদীপ্তা নামে আমার এক গাইয়ে বান্ধবী এসেছিল সাড়ে পাঁচটার সময়।

—সুদীপ্তা কোথায় থাকে?

—থাকে বালীগঞ্জ প্লেসে। তবে এখন আর ওখানে পাওয়া যাবে না। আমার বিয়ের দিন পাঁচেক পরেই দিল্লী চলে গেছে।

—হঠাৎ দিল্লীতে কেন?

—মিউজিক কনফারেন্সে। আমাদেরও যাবার কথা ছিল।

প্রায় মিনিট খানেক মাথা নিচু করে ভ্রূ কুঁচকে নীল কি যেন ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—একটা অড্ প্রশ্ন করছি। তোমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—পাপড়ির দিক থেকে অন্য কারো প্রতি দুর্বলতার কিছু ছিল কিনা জান তুমি?

—কি বলছেন আপনি?

—প্রশ্ন কোর না, উত্তর দাও।

—না। বেশ দৃঢ় স্বরেই ও বলল,—এ রকম কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—এমন কি শুনেছ কখনও পাপড়িকে অন্য কেউ প্রপোজ করেছে?

—সে রকম কিছু ঘটলে আমি জানতে পারতাম। পাপড়ি আমায় না বলে থাকতে পারত না।

—এই বিয়ের ব্যাপারে কেউ কোন হুমকি দিয়েছিল? মানে তোমাদের এ বিয়ে হতে দেবে না—এই রকম কিছু?

—ওর বাড়ির লোকের আপত্তি ছিল, এটা জানতাম। তার জন্যে আমি পাপড়িকে অনেকবারই বলেছিলাম আমার কথা ভুলে যেতে। কিন্তু এসব কথা ও কোনদিন কানেও তোলে নি। তবে আপনি যে ধরনের হুমকির কথা বললেন, তা কোনদিনও শুনিনি।

—ডাঃ অরিন্দম বাসুকে চেনো?

—চিনি না, তবে পাপড়ির মুখে ওনার নাম শুনেছি।

—আর কিছু শোন নি?

—কই না তো।

—পাপড়ি দেবীর মাছ পোষার শখ কত দিনের?

—অনেক দিনের। ও বলেছিল বিয়ের পর অ্যাকোয়ারিয়ামটা আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে।

—তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

—না। তা যদি হত, মনের যা অবস্থা, এতদিনে হয়ত তাকে আমি খুন করতাম।

নীল ওর গাম্ভীর্য খসিয়ে ফেলল। হেসে হেসে বলল—ভাগ্যিস কর নি। তাহলে দুটো কেস নিয়ে আমার হিমশিম খেতে হত। যাক, তুমি আজ বাড়ি যাও। প্রয়োজন হলে কিন্তু আমি তোমার ওখানে যাব।

উদ্দালক বিনয়ের সঙ্গে বলল—যাবার দরকার নেই। আমায় খবর দিলেই আসব।

—তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কি আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে হবে?

—আপনার ক্ষেত্রে আলাদা। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বোধহয় তাই। আমি ঠিক বলতে পারব না ওনার এখনকার পরিস্থিতি কি?

নীল একটা প্যাড এগিয়ে দিয়ে বলল—এতে তোমার আর তোমার মায়ের ঠিকানা লিখে রেখে যাও। তোমার অফিসের ঠিকানাটাও দিও।

একটু পরেই উদ্দালক চলে গেল। নীল ওকে এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরতেই আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। হাত তুলে আমায় থামিয়ে বলল—তার মানে, তোর লিস্টে আরো একজনের নাম বাড়ল, তাই না?

অবাক হয়ে আমি বললাম—আরো একজন মানে?

—এ ক'দিনে সন্দেহের তালিকায় তুই যাকে যাকে চিন্তা করেছিলি, সেই তালিকায় আরো একটা নাম ইনক্লুডেড হল। অর্থাৎ উদ্দালক এসে মাথাটা আরো গুলিয়ে দিল। এই ত?

নীল বোধহয় সত্যিই অন্তর্যামী। এতক্ষণ আমি তাই ভাবছিলাম। বললাম,—উদ্দালককে কি বাদ দেওয়া যায়?

নীল উত্তর দিল—ঘটনা আর ওর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ওকে বাদদেওয়া যায় না। অর্থাৎ সিগারেটের ব্রাণ্ড, কাটা রাংতা যত্ন করে রেখে দেওয়া এগুলো ওর বিপক্ষে রায় দেবে। তারপর, পাপড়ি খুন হয়েছে ধর সোয়া ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে। উদ্দালকের বক্তব্য অনুসারে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে পৌনে সাতটা পর্যন্ত ওর কাছে কেউ ছিলই না। একজন ছিল। সুদীপ্তা। কিন্তু সে যে ঐ সময় উদ্দালকের কাছে ছিলই তার কোন প্রমাণ নেই। একমাত্র ওর বক্তব্য সত্যি বলে মেনে নিলে, ছিল। কিন্তু বিনা প্রমাণে ত কিছু মানা যাচ্ছে না।

যে প্রমাণ, সে ত কলকাতা থেকে ন'শ মাইল দূরে। অর্থাৎ সুদীপ্তার থাকার কথাটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে বিকেল পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত উদ্দালক যে বাড়িতেই ছিল তারও কোন প্রমাণ নেই।

আমি বাধা দিলাম—কিন্তু যে ছেলে এমন করে কাঁদতে পারে—

নীল ধমকে উঠল—অজু, সস্তা সেন্টিমেণ্ট দিয়ে গোয়েন্দাগিরি চলে না। ও যে একজন বড় অভিনেতা নয় কি করে বুঝলি? ভুলে যাস না ওর রক্তে অভিনয়ের ধারা রয়েছে। ওর মা একজন বড় অভিনেত্রী।

আমি বোকা। এবং থ। নীল বলে কি? যে ছেলে তার প্রেমিকাকে হারিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে পারে, সে হবে কিনা সেই প্রেমিকার খুনী? আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নীল প্রথমে ঠিকই বলেছিল—কেসটা খুব জটিল। কিন্তু আরো একটা বড় কথা, উদ্দালকের মোটিভ কি? নীলকে তাই প্রশ্ন করলাম।

নীল চট করে কোন মন্তব্য করল না। তারপর বলল, সেইখানেই ত কথা। মোটিভ বিচার করতে গেলে উদ্দালককে খুনীর তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। পাপড়িকে হত্যা করার মধ্যে ওর কোন জোরালো মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং ভেবে দেখতে গেলে বিয়ের আগে পাপড়িকে খুন করলে ওরই লোকসান। রামতনুবাবুর উইল অনুসারে ওনার সম্পত্তির অর্ধাংশ বিয়ের পর উদ্দালকের হতে পারত। তাই উদ্দালক পাপড়িকে খুন করতে চাইলে বিয়ের পর করবে, আগে নয়।

—তাছাড়া, নীলের কথার মধ্যেই আমি বলে ফেললাম—যত বড় পাকা অভিনেতাই হোক, এ ত রেগুলার স্পোর্টসম্যানের কাজ। পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে বিয়ের বর মেয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে সবার চোখে ধুলো দিয়ে খুন করে এসে আবার ঠিক সময়ের মধ্যে নিপাট ভালো মানুষ সেজে বিয়ে করতে আসা, নাঃ, নীল তুই যা-ই বলিস, ও আমি যুক্তি দিয়ে মানতে পারছি না।

নীল মুচকি হাসল—তার মানে তুই কিছুতেই চাইছিস

উদ্দালককে খুনী বলতে।

—সত্যি করে বল না, তোরও কি তাই মনে হয় না?

—মনে হওয়া দিয়ে কিছু হয় না, প্রমাণটাই বড়। তবে তোকে আমি উদ্দালকের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে পারি। ওকে খুনীদের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারিস।

যাক, বাঁচালি। সিগারেটের প্যাকেটটা ত আমাকে রেগুলার চিন্তায় ফেলেছিল। এবার তুই কত দূর এগোলি?

বেশ বুঝলাম নীল এড়িয়ে গেল আমার প্রশ্নটা, বলল, জট, জট, চারিদিকে কেবল জটের উর্ণনাভ। তুই নিশ্চয়ই এ ক'দিন ভেবে সবাইকে খুনী বলে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিস?

—তা করেছি। আমার ভাবনায় সবাই খুনী। কাউকে বাদ দিতে পারছি না।

খুবই স্বাভাবিক। প্রথমটা আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তা ত আর নয়। খুনী একজনই। তবে মনে হয় তাকে সাহায্য করে-ছিল অন্ততঃ দু'-একজন।

—কে কে?

—জানি না। সেসব কিছু বুঝতে পারছি না। আসলে প্রত্যেকেই এমন চুপ করে আছে যে, আসল কথা কারো মুখ ফসকে বেরুচ্ছে না। সামান্য একটা সূত্রের সন্ধানও কেউ দিচ্ছে না।

—কি ধরনের সাহায্য করেছিল কিছু আঁচ পেয়েছিস?

—খুনী বাড়ির বাইরে থেকে এসেছিল। সে খুব চেনা লোক। কোন একজন খিড়কির দরজা আগে থেকেই খুলে রেখেছিল। চাবি চুরি করেছিল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলে খুনীকে সংকেত জানিয়েছিল পাপড়ি এখন ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু সে বা তারা কারা? একজনেরও হদিস পাচ্ছি না।

—সুদাম হতে পারে কি?

—পারে! মালতিও হতে পারে! শর্মিষ্ঠা বা মালবিকা এদেরও

কেউ হতে পারে। আসলে খুনীর থেকে খুনীর সাহায্যকারীকে ধরতে পারলে এখন অনেক কাজ দেয়।

—এ ক্ষেত্রে কোন্ মোটিভটার ওপর তুই বেশী জোর দিচ্ছিস ?

—সেও এক সমস্যা। প্রেম না অর্থ ? প্রতিহিংসা না লোভ ?

—আমি বুঝতে পেরেছি, তুই কোন্ দুজনকে সব থেকে বেশী সন্দেহ করছিস।

—হ্যাঁ, সুতনুর লোভ আর অরিন্দমের প্রতিহিংসা! আচ্ছা বলতে পারিস, তুই ত লিখিস-টিখিস, প্রেম আর অর্থ, কার আকর্ষণ সব থেকে বেশী ? কে মানুষকে চরম কিছুর দিকে টেনে নিয়ে যায় ?

বড় কঠিন প্রশ্ন করল নীল। প্রেম বড় না অর্থ বড় ? প্রেমের জন্যে মানুষের সর্বস্ব ত্যাগের ঘটনাও বিরল না। আবার অর্থের কারণে অনর্থ লেগেই আছে। প্রবঞ্চনার জ্বালা অথবা প্রার্থিত রমণীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দুঃখ বহু মানুষকে বিপথে নিয়ে গেছে, এ জগতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কোনটাই ফেলে দেওয়ার না। অর্থাৎ সুতনু আর অরিন্দমের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে। আমি তাই-ই নীলকে জানালাম। আরও বললাম—যদিও এ দু' জনের যে কেউ একজন হতে পারে, তবে তোর একদিনের একটা কথার উল্লেখ করেই বলছি, আমার সন্দেহ অরিন্দমের ওপর বেশী। কারণ তুই-ই বলেছিলি, খুনের প্রক্রিয়া খুনীর চরিত্রকে ফ্ল্যাশ করে। খুনের নমুনা দেখে অনেক সময়েই বোঝা যায় খুনীর পেশা কি ? এক্ষেত্রে—

বাধা দিল নীল—আমি জানি, অরিন্দমকেই সব থেকে বেশী সন্দেহ করা উচিত। সন্দেহ আমিও করি। কিন্তু প্রমাণ কই ? প্রমাণ ? প্রমাণ না পেলে আমার হাত-পা সব বাঁধা। এতক্ষণ নীল কথাগুলো বলছিল সমানে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে। এটা ওর অনেক দিনের পুরনো অভ্যেস। ছোট থেকেই দেখছি। খুব অন্যমনস্ক আর অস্থির চিন্তা ওর মাথায় থাকলে ও ঘন ঘন একটা নির্দিষ্ট জায়গার

মধ্যে পায়চারি শুরু করে দেয়। মনে মনে ও কতটা অস্থির তা আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি।

কিছুক্ষণ এইভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল জানলার ধারে—চল অজু, একটু ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—ঠাণ্ডা হাওয়ায়। মাথাটা বড় জ্যাম হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগালে আর মাথা ধরা ছাড়বে না।

—ঠিক করে বল ত কোথায় যাবি?

—চল্ না বেরুই।

জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আকাশটা বেশ অন্ধকার। নীলের মাথায় এখন কোথায় যাওয়ার মতলব বুঝতে পারছি না। ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার জন্যে যে বাইরে যাচ্ছে না তা আমি জানি। আলোয়ানটা ভাল করে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক গাড়ি চালালো। একসময় আমরা গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছলাম। কি যে ও করতে চায়, কোথায় ওর যাবার মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজে থেকে কিছু না বললে ওর মুখ থেকে এ সময়ে কিছু কথাই বের হবে না। গাড়ি চালাতে চালাতে ও বারবার ঘড়ি দেখছিল। হঠাৎ গঙ্গার ধার থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা করে রেড রোডে এসে পড়ল। গাড়ি চলছে দু'পাশে ময়দানকে রেখে সোজা উত্তর মুখো। এবার আর না জিজ্ঞেস করে পারলাম না—কোথায় যাচ্ছিস তা বলবি, না বলবি না?

রাস্তার ওপর দৃষ্টিকে স্থির রেখে বলল—যাচ্ছি অভিসারে।

—মানে?

—প্রেম।

—ইয়ার্কি হচ্ছে ?

—কেন, ইয়ার্কির কি আছে ? একটা প্রেম আমি করতে পারি পারি না ?

—এখন তোর প্রেম করার সময় ? আর সেটা আমায় বিশ্বাস করতে হবে ?

—বিশ্বাস না করলে আমার কিছু বলার নেই। তবে দেখতেই পাবি চল্।

পার্ক স্ট্রীট দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল। লাল সিগন্যাল পেয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াতে হল। লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মুখে এসে ধীরে ধীরে গাড়িটাকে দাঁড় করাল পার্কিং জোন-এ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে ছ'টা।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ও কিন্তু নেমে পড়ল না। মনে হল ও যেন কাউকে খুঁজছে। এমন সময় বাইশ-তেইশ বছরের একটা ছেলে এসে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে গেল ওয়াইপারটার গায়ে। তারপর বোধ হয় মিনিট তিনেক কাটেনি, এমন সময় নীল সচকিত হয়ে উঠল, বলল—বিশ্বাস করছিলি না ত ?

—কি ?

—ঐ যে অভিসারে যাবার কথা ?

—ত কি ?

—শ্রীরাধা এসে গেছেন। সামনের দিকে চেয়ে দেখ। টাইগারের ঠিক নিচে। দেখতে পাচ্ছিস লাল রঙের শাড়ি পরা আর গায়ে ঘি রঙের লেডিস শাল। আমি যতক্ষণ না আসি কোথাও যাবি না। আর এই নে, এটা সঙ্গে রাখ। সাদা পোশাকে কিছু পুলিস এদিকে ঘুরঘুর করে। এটা দেখালেই আর হাঙ্গামা হবে না।

দ্রুত কথাগুলো বলেই ও নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করল। দূর থেকে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মেয়েটি

কে? নীলের দেওয়া কার্ডটা খুলে দেখলাম। ওর আইডেনটিটি কার্ডটাই আমাকে দিয়ে গেছে।

কিন্তু এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? নীল প্রেম করছে? আর সেটা এতদিন আমাকে না জানিয়ে? এর থেকে অবাস্তব ঘটনা আর কি ঘটতে পারে?

মুহূর্তে জগৎ সংসারের ওপর আমার কেমন যেন অবিশ্বাস হয়ে গেল। পারে, পারে, মানুষ সব কিছু করতে পারে। অর্থের জন্যে ভাই বোনকে হত্যা করতে পারে। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে প্রেমিক প্রেমিকাকে খুন করতে পারে। নীল আমাকে লুকিয়ে প্রেমও করতে পারে।

ছিঃ নীল, ছিঃ, এ ধরনের ব্যবহার আমি তোর কাছ থেকে আশা করতে পারি নি। রহস্য-টহস্যর ব্যাপারে আমার কাছে ও অনেক সময় অনেক কিছু গোপন করে এবং অতীতেও করেছে, তার জন্যে খুব একটা কিছু মনে করি নি। কারণ সেগুলো ও যদি আমার কাছে বলে দেয় আর আমি উল্টো-পাল্টা জায়গায় প্রকাশ করে ফেলি তাহলে ওর তদন্তের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু এই প্রেম করার ব্যাপারটা? এটা যদি আমি কোথাও বলেই ফেলি তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বড় জোর একটু হাসাহাসি হতে পারে। সোমেন জেঠু নতুন করে নীলের পেছনে লাগার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমি ওর অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। আমাকেই কিনা—

গাড়ির কাচগুলো তুলে রাজ্যের অভিমান নিয়ে বসে রইলাম। এর একটা বিহিত করা দরকার। একটা কৈফিয়তের আমার প্রয়োজন। ও যদি আমাদের মধ্যে গোপনীয়তার বেড়া তুলতে চায়, তুলুক। আর না। আমিও তাহলে সেই ভাবেই ওর সঙ্গে মেলামেশা করব।

কতক্ষণ কেটেছিল জানি না। বসে বসে একটা ঝিমুনির ভাব এসেছিল। হঠাৎ উইণ্ড স্ক্রীনে টরে-টক্কার আওয়াজ পেলাম। নীল ফিরে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। রাত আটটা। মানে

পাক্কা দেড় ঘণ্টা গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছি। গাড়িটা ভেতর থেকে লক করা ছিল। দরজাটা খুলে দিলাম।

একটাও কথা বললাম না। একবারও জিজ্ঞাসা করলাম না, মেয়েটা কে ? কোথায় থাকে ? এতক্ষণ ও কোথায় ছিল ? কেবল আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখলাম, ঘণ্টা তিনেক আগের সেই চিন্তাচ্ছন্ন নীল কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। বদলে একটা খুশি-খুশি রোম্যান্টিক মেজাজ।

স্টীয়ারিং টেনে অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করল। গুনগুন করে অস্পষ্ট একটা থামা থামা সুরও ভাঁজছে।

যেমন আমিও ওর সঙ্গে কোন কথা বললাম না, নির্লজ্জ নীলও আমার সঙ্গে কোন কথা বলার ভাব দেখালো না। গোল্লায় গেছে। একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। অনুতপ্ত হয়ে সামান্য কিছু বললেও এ সময়ে আমার অভিমানটা কেটে যেত। কিন্তু ওর এই একা একা প্রথম প্রেমের পুলকিত আস্বাদন নেওয়াটা আমার ভেতরে একটা চিড়বিড়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

মানুষ প্রেমে পড়লে এত স্বার্থপর হয়ে যায় ? ভুলে যায় তার বন্ধুকে ? ভুলে যায় তার কাজকর্ম আর কর্তব্যজ্ঞান ? এত বড় একটা দায়িত্ব মাথার ওপর ঝুলছে। সেদিকে একবারও নজর দেবার সময় নেই। সিম্পল লায়নের কাছে ত মুখ দেখানো যাবে না !

বয়ে গেল। বয়ে গেল। আমার কি দরকার অত ভাবার ? কেসটা সলভ্ করতে না পারলে ওরই ডিসক্রেডিট। আর আমিও যেমন বোকা ! কলেজ, লেখা সব মাথায় তুলে দিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে অসুস্থ শরীর নিয়ে ওর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি ? রেখা ঠিকই বলে, এসব বিলাসিতা নীলের মত খামখেয়ালী বড়লোকদেরই মানায়।

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে খেয়াল করিনি ও সম্পূর্ণ উল্টো দিকে চলেছে। গাড়ি তখন হিন্দ সিনেমার কাছে। আর চুপ করে থাকতে

পারলাম না। একে আমার অসুস্থ শরীর, তার ওপর নীলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশী রাত করে বাড়ি ফেরা যাবে না। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, ও কোথায় যেতে চায় ?

তার আগেই নীল বলে উঠল—রাগ করেছিস ?

অভিমানে আমার প্রায় কান্না পাবার যোগাড়। জীবনে এমন কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যখন কেউ ঠাস্ করে মারলে লাগে না, অথচ সামান্য একটা কথায় চোখে জল এসে যায়। এসব কথা নীল বুঝবে না। তাই চুপ করেই রইলাম।

নীল হেসে বলল—নয় একটা প্রেমই করলাম। তাতে এত রাগ ? আচ্ছা, তুই বল না প্রেম করাটা কি অপরাধের ?

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—না, অপরাধ না। তবে তুই কি করছিস না করছিস সে তোর ব্যাপার। আমাকে বলার কোন দরকার নেই। এখন কোথায় যাচ্ছিস বলবি ? আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

হাসি বজায় রেখেই নীল বলল—বলব। সব তোকে বলব। কিন্তু পাপড়ির হত্যাকারীকে ধরার প্রয়োজন নেই ?

—তোর রকম-সকম দেখে তো মনেই হচ্ছে না, ঐ ব্যাপারে তুই ওরিড।

—প্রেম করলে কি পাপড়ির হত্যাকারীকে ধরা যায় না ?

—হয়ত যায়। আমার কোন ধারণা নেই।

—আচ্ছা বেশ, আমি তোকে কথা দিচ্ছি, আর এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পাপড়ির হত্যাকারীকে তোদের সামনে তুলে ধরব।

চমকে উঠলাম। নীল কখনও কাউকে বাজে কথা বলে না আমার বিশ্বাস। ভণিতা বা মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া ওর চরিত্রে লেখে নি। ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ঠোঁটের কোণে একটা সুন্দর আর রহস্যময় মিষ্টি হাসির প্রলেপ ছড়িয়ে রয়েছে। এই হাসিটাই আমার এতক্ষণ প্রেমিকের প্রশান্ত হাসি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু অভি-

মানের জ্বালায় এই হাসির যে আর একটা অন্য অর্থ আছে, তা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে কি পাপড়ির হত্যারহস্য সমাধানের পথে? ও জানতে পেরেছে কে খুনী?

প্রতিবারের মত এবারও আমার তর সইল না। রাগ অভিমান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললাম—নীল, প্লীজ, লুকোস না। তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস, কে খুনী? বল মাইরি?

– বলব।

– সময় এলে, তাই ত?

—হ্যাঁ বৎস।

—এখন কোথায় যাচ্ছিস?

-- আজ বিকেলে তুই যখন উদ্দালকের সিগারেট খাওয়া দেখে আশ্চর্য হয়েছিলি, আমিও তখন সামান্য একটু দ্বিধায় পড়েছিলাম। তবে সেটা সাময়িক। কারণ উদ্দালক খুন করে নি। তোকে আর একটা চমক দোব, চল্।

ও আর একবার ঘড়ির দেখল—নাউ ইট ইজ দ্য রাইট টাইম। এর পরে বা আগে গেলে ভদ্রলোককে পাওয়াই যায় না। এই নিয়ে তিন দিন গেলাম। আজ একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে এসেছি। উঃ, যা বিজি—

—এটাও তোর আর একটা সাসপেন্স?

—না। যাচ্ছি ডাঃ অরিন্দম বাসুর চেম্বারে। ওনার চেম্বারটা আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের ক্রসিং-এ। এই ত এসে গেছি। অ্যাণ্ড ইন রাইট টাইম।

বলতে বলতেই গাড়িটা থামল ডাক্তার বাসুর চেম্বারের সামনেই। বেশ সাজানো আর বড়-সড় চেম্বার। দু একজন রোগী তখনও বসে ছিলেন। আমাদের দেখে ডাক্তার হেসে ফেললেন। একবার ঘড়ি দেখে বললেন—ঘড়ির কাঁটাকেও হার মানিয়ে দিলেন মশাই? কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা?

নীল হেসে বলল—গাড়িটা তেমন কোথাও আটকায় নি, তাই সময়ে আসা গেল।

—বাঙালির ছেলেদের এত পাংচুয়ালিটি আগে দেখিনি মশাই। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—হ্যাঁ, এই বসি। কিন্তু এনারা?

—সব হয়ে গেছে। ওষুধ নিয়েই ওনারা চলে যাবেন। চলুন, পাশের ঘরে যাওয়া যাক। কি খাবেন—চা না কফি?

শীতকাল, কফি হলে মন্দ হত না।

—ও. কে., আমি ব্যবস্থা করে আসছি। তবে খুব একটা সুস্বাদু হবে না, আগেই বলে রাখছি।

—আমার সব কিছু অভ্যেস আছে। আপনি বলে আসুন। আমরা বরং পাশের ঘরে বসছি।

পাশের ঘরটায় গিয়ে বসলাম। নীলের চলাফেরা দেখে মনে হল এর আগে ও এখানে এসেছে। ঘরটা যেন ওর চেনা।

এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের। রুগীদের বিশেষ ধরনের পরীক্ষার জন্যে যেমন অ্যাটাচড্ ছোট চেম্বার থাকে, সেই রকমই। ছোট আকারের চেয়ার পাতা রয়েছে। আর একটা লম্বা বেড। দেওয়ালে দেজ মেডিকেলের বড় রেডক্রস মার্কা অল-মান্থ ক্যালেণ্ডার ঝুলছে।

ক্যালেণ্ডারটার উপর কোন বিশেষত্ব ছিল না। তবু একটা বিশেষ চিহ্ন আমাকে আকৃষ্ট করল। একটা মাসের একটা তারিখের গায়ে লাল কালিতে গোল মার্ক দেওয়া রয়েছে। কেন, এই কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ঐ দিনটাই ছিল পাপড়ির বিয়ের দিন। মনে মনে একটা 'আশ্চর্য', না বলে থাকতে পারলাম না। নীলের দিকে তাকাতেই দেখি, ও মিটমিট করে হাসছে। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করতে যাব, হঠাৎ পর্দা ঠেলে ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকলেন।

আমরা দুজনে দুটো চেয়ারে বসেছিলাম। কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে

আর একটা চেয়ার আনিয়ে উনি আমাদের সামনে বসতে বসতে বললেন—এবার বলুন কি আপনার বক্তব্য ? বলেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

বিকেলে যখন উদ্দালক সিগারেটের প্যাকেট বার করেছিল তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম। এখন চমকে উঠলাম। নীল ঠিকই বলেছিল—তোকে একটা চমক দোব।

এটা চমকই। কেবল প্যাকেট দেখে না। প্যাকেট খুলতেই দেখলাম রাংতাটা ঠিক সেই রকমই। ফেলে দেওয়া হয়নি। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেটটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। আমাদের দুজনের কিন্তু কেউই প্যাকেটটা ছুঁলাম না। এ একটা ডেঞ্জারাস লোক—এই ভেবে আমি নিলাম না। নীল কেন নিল না জানি না।

কথা আরম্ভ করল নীলই। —ডাক্তার বাসু, বুঝতেই পারছেন বিশেষ প্রয়োজন না হলে এভাবে আপনাকে ডিসটার্ব করতাম না। একান্ত বাধ্য হয়েই—

—না না। সে কি কথা! আমি নিজেই ত আপনাদের সঙ্গে আজ অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছি। তা ছাড়া ক্ষমা আমারই চাওয়ার কথা। তিন দিন আপনাকে সময় দিতে পারি নি। যা বিচ্ছিরি আমাদের প্রফে-শান। সামাজিকতার ব্যাপার স্যাপার সব বিসর্জন দিতে হয়েছে। নেহাৎ বাবা ডাক্তার ছিলেন তাই, না হলে এই বৃত্তি আমার খুব একটা মনঃপূত ছিল না। সমাজের মধ্যে থেকেও এক অসামাজিক জীব হয়ে রয়েছি।

—অসামাজিক বলছেন কেন ? নীল যেন ভদ্রতা করল—আপনারা না থাকলে সমাজটাই ত লোপাট হয়ে যেত। সভ্যতা থেমে যেত, সংসারে যদি চিকিৎসক না থাকত।

বিনয়ে গলে গিয়ে ডাক্তার বললেন—ও কথা থাক। আপনার আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে, আমি বুঝতে পারছি। বলুন

আপনার কি প্রশ্ন ?

ইতিমধ্যে চাওয়ালা ছোঁড়াটা তিন কাপ কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল—একান্ত আপত্তি না থাকলে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।

ডাক্তার সোজাসুজি নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন—নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় না হলে নিশ্চয় উত্তর দোব।

—আপনি ত ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ, লণ্ডনেই দময়ন্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

—আপনার স্ত্রী বোধহয় অবাঙালি ছিলেন ?

—কি করে বুঝলেন ?

—দময়ন্তী নামটা সাধারণতঃ বাঙালি মেয়েদের হয় না।

—ঠিকই ধরেছেন। ও ইউ. পি.-র মেয়ে।

—উনিও কি ডাক্তার ?

—মস্ত বড় ভুল সেখানেই হয়েছিল। সেম প্রফেশানের কাউকে বিয়ে করা বোধ হয় আমার উচিত হয় নি। কয়েকটা ইগো আর পারসোন্যালিটির দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল বিয়ের পরই। শেষকালে অশান্তিটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো, তখন বাধ্য হয়েই—

—আপনাদের বিবাহবিচ্ছেদ কতদিন হয়েছে ?

—বছর দুয়েক।

—ছেলে মেয়ে ?

—এক মেয়ে। সে তার মায়ের কাছেই থাকে।

—তাঁরা কি বর্তমানে কলকাতায় আছেন ?

—না। বিবাহবিচ্ছেদের পর দময়ন্তী মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে গেছে।

—দময়ন্তী ছাড়া আপনার জীবনে আর কোন মহিলা এসেছিলেন কি ?

—না।

—ভাল করে ভেবে উত্তর দিন। সামান্য দুর্বলতা?

—মিঃ ব্যানার্জী, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।

—বেশ, আমি বুঝিয়ে বলছি।

এই বলে নীল সেদিন অতনুবাবু ওনার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন, সবকিছু বলে গেল। তারপর বলল—এইবার বুঝতে পারছেন কেন এই সব প্রশ্ন তুলে আপনাকে উত্ত্যক্ত করছি?

ডাক্তার থুঁতনীর উপর দুটো হাত রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে নীলের কথাগুলো শুনছিলেন। ওর কথা শেষ হতেই ভেবেছিলাম উনি হয়ত প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। কিন্তু আমার ধারণা পালটে দিয়ে অদ্ভুত ধরনের একটা হালকা শব্দহীন হাসি হাসতে হাসতে বললেন—লোকটা এতটা শয়তান, তা আগে ভাবতে পারি নি। মানুষ যে স্বার্থের জন্যে কোথায় নামতে পারে, অতনু লাহিড়ীকে না দেখলে বোঝা যায় না। শেষে আমাকেই খুনী করে তুলতে একটুকু বাধল না। আশ্চর্য!

—পাপড়িদেবীর সঙ্গে আপনার এই ধরনের কোন কথা হয় নি?

—মিস লাহিড়ীর সঙ্গে আমার কোনদিনও এ ধরনের কোন সম্পর্ক ছিল না। আর আমি ত মাত্র কিছুদিন ওদের বাড়ি যাতায়াত করছি।

—কতদিন হবে?

—বছর দুয়েক।

—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের আগে না পরে?

ডাক্তার চকিতে একবার নীলকে দেখে নিয়ে বললেন—ঠিক মনে নেই।

—তা হলে আপনি বলতে চাইছেন আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পাপড়িদেবীর কোন কথাবার্তা কখনোই হয় নি?

—একমাত্র অসুখ বিসুখ ছাড়া কখনোই তেমন কিছু হয় নি।

—আপনার কি ধারণা আছে, কেন অতনুবাবু আপনার সম্বন্ধে এই ধরনের মিথ্যে গল্প বলতে পারেন?

—এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় পারি। অনেক দিন আগে উনি আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, আমি সেটা ইগনোর করি। সেদিন উনি বলেছিলেন—কাজটা ভাল করলে না ডাক্তার, পরে টের পাবে।

—প্রস্তাবটা কি?

—ডু ইউ নো দ্যাট হি ইজ মরফিন অ্যাডিক্টেড?

ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তার মানে?

—তার মানে, আজ বছর দুয়েক উনি মরফিনে আসক্ত। আর এটা নিশ্চয় জানেন, মরফিন অ্যাডিকশান একটা সর্বনাশা নেশা। একবার কোন লোক এর খপ্পরে পড়লে তার আর নিস্তার নেই। নেশাটা বেড়েই চলে নিতে নিতে। আর নেশার সময় অ্যামপুল না না পেলে সে প্রায় পাগলের মত হয়ে যায়। সে অবস্থাটা ওর এখনও আসে নি। তবে আসবে। আমার কথাটা কোন রাগ বা অন্য কিছু থেকে নয়। আর কিছুদিন পরই দেখতে পাবেন শরীরটা ক্রমশঃ ওর বেঁকে যাবে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে কাঁপতে থাকবে নেশার সময় ওষুধ না পেলে।

—কিন্তু,—নীল বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করল—তার জন্য আপনার ওপর ওঁর বিদ্বেষ কেন?

—কারণ আমি ওঁদের হাউস ফিজিসিয়ান হয়েও পারমিট যোগাড় করে দিই নি বলে।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আগেই বলেছি, নেশাটা কমে না। দিন দিন বেড়ে যায়। সারাদিনে তখন একটা দুটো অ্যামপুলে কোন কাজ হয় না। এত বেশী অ্যামপুল দরকার হয় যখন এইসব নেশাড়ুদের ডাক্তারের শরণা-

পন্ন হতে হয়। ডাক্তারদের ঘুষ দিয়ে বা নেশা ধরিয়ে তাদের নামে পারমিট যোগাড় করে এঁরা ওষুধ, আই মিন নেশার যোগাড় ঠিক রাখেন। আজকাল বেশ কড়াকড়ি হওয়ার জন্যে উইদাউট ডক্টরস্ প্রেসক্রিপশান কোন ওষুধ কোম্পানীই মরফিন বিক্রি করে না। অতনু লাহিড়ী এসেছিলেন আমার নামে পারমিট বার করে নিজের নেশার বন্দোবস্ত করতে। আমি রাজী হই নি। প্রথমতঃ, এটা আমার নীতি-বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, আমি ওঁদের পরিবারের ডাক্তার। ভয়াবহ পরি-ণতির কথা চিন্তা করেই ওনাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার মনে হয় এই কারণেই উনি আমার উপর প্রতিশোধ তুলতে চান। তবে আমিও ডাক্তার অরিন্দম বাসু। দেখা যাক, অতনু লাহিড়ীর দৌড় কতটা ?

ভ্রূকুটি করে নীল ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো শুন-ছিল। একটু পরে ও বলল—আর দুটো প্রশ্ন করেই আমরা উঠব। আচ্ছা, সত্যিই সেদিন আপনি বুঝতে পারেন নি, পাপড়িদেবীর কিভাবে মৃত্যু হয়েছে।

—হ্যাঁ। পেরেছিলাম।

—বলেন নি কেন ?

—পুলিসকে আমি দূরে দূরে রাখতে চাই। অযথা কেসটার মধ্যে জড়িয়ে যাবার ইচ্ছে আমার এখনও নেই।

—কিন্তু ডাক্তার হিসাবে এটা আপনার জানানো উচিত ছিল।

—না জানিয়েও আপনারা আমায় ছাড়ছেন না। জানালে ত ফেঁসে যেতাম।

—দেবতনু লাহিড়ীর স্ত্রী কি সত্যিই বদ্ধ পাগল হয়ে ও বাড়িতে আছেন ?

ডাক্তার কয়েক মিনিট নীরবে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন —হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা সত্যিই পাগল।

—কতদিন ওঁর ওই পাগলামি ?

—জানি না, তবে অনেক দিনের কেস, এই রকমই শুনেছি।

—শুনেছেন কেন? আপনি নিজে তাঁকে কোনদিন অ্যাটেণ্ড করেন নি?

—একবার। সেদিন বড় বাড়াবাড়ি করছিলেন। তাই—

—ভদ্রমহিলা কার আণ্ডারে আছেন, আপনি জানেন?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় উনি কোনদিনও ভালো হবেন না?

—প্রথমতঃ, আমি সাইক্রিয়াটিস্ট নই। হলে বলতে পারতাম। তবে মডার্ন ডাক্তারী শাস্ত্র অনেক ডেভেলাপ্‌ড্‌। ঠিক মত ট্রিটমেণ্ট হলে সেরে যেতেও পারেন।

—তার মানে ওঁর ঠিকমত চিকিৎসা হয় না?

—কি করে বলব বলুন? উনি ত আমার পেশেণ্ট না, তবে মনে হয় ট্রিটমেণ্ট হয় না।

—হুঁ। আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, মালবিকাদেবী সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে?

—মালবিকাদেবী? মানে, অতনু লাহিড়ীর স্ত্রী? উনি আর এক ম্যানিয়াগ্রস্ত। স্বামীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। স্বামী সামনে থাকলে বেশ মুখরা এবং রগচটা। কিন্তু অন্য সময়ে গেলে আপনার সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করবেন। আমার ধারণা, অতনু-বাবুর কাছ থেকে উনি বোধ হয় কোন ব্যাপারে শকড্‌। বিশেষতঃ ঐ রকম নেশাগ্রস্ত লোককে কোন্‌ স্ত্রী সহ্য করে বলুন?

—নেশা ছাড়া আর কিছু আঁচ করতে পারেন?

—এমন কিছু না। তবে সাইকোলজিক্যালি বলতে পারি, ইস্যু না হলে মেয়েরা তাঁদের স্বামী সম্বন্ধে বেশ কমপ্লেক্সে ভোগেন। সেই থেকেও এটা হতে পারে।

—অনেক ধন্যবাদ এই ইনফরমেশনের জন্যে। আচ্ছা, আজ

আমরা উঠি। বলেই নীল উঠে পড়ল।

গাড়ি যখন ল্যান্সডাউনে, নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তারের সব কথা তুই বিশ্বাস করিস?

—কিছু কিছু করি।

—কিছু বলতে?

—অতনুবাবুর নেশার ব্যাপারটা ঠিক। মালবিকাদেবী বা দেবতনু-বাবুর স্ত্রী সম্বন্ধে যা বললেন, সেটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

—অতনুবাবু যে অ্যাডিকটেড, এটা তুই জানতিস?

—কিছুটা। কিন্তু পাপড়ির সঙ্গে ডাক্তারের কোনদিন কোন কথাবার্তা হয় নি, এটা ঠিক বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। কে জানে ডাক্তার ঠিক বলছেন, না অতনু লাহিড়ী ঠিক বলছেন? দেখা যাক। আমি নীল ব্যানার্জী। বেশী দিন মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে দিচ্ছি না। আসল সত্যটা খুঁজে বার করবই।

—আমি হলে কিন্তু এখনই ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করতাম।

—কোন্ গ্রাউণ্ডে? ভুলে যাস না অজু, অর্থে এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে ডাক্তার অরিন্দম বাসু একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তাঁর একটা অন্য স্টেটাস আছে। এ কি ঠেলাওয়ালা, না হকার? বিনা প্রমাণে ধরে ঢুকিয়ে দিলেই হল? প্রমাণ চাই, প্রমাণ। নিশ্চিত একটা প্রমাণ।

—কিন্তু স্পষ্টই ত বোঝা যাচ্ছে, এ ধরনের মার্ডার একমাত্র ওঁর পক্ষেই সম্ভব। সামান্য কারণে অতনুবাবু ডাক্তার ভদ্রলোকের ওপর একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলবেন, আমার তাও বিশ্বাস হয় না।

—ওই যে বললাম—নিশ্চিত প্রমাণ। সেটা কি দিয়ে করবি? অতনুবাবুর ডাক্তারের ওপর রাগ আছে। আবার ডাক্তারও নিশ্চয় কোন কারণে অতনুবাবুকে সহ্য করতে পারেন না। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, পুরনো রাগের কারণে দুজনেই দুজনকে ফাঁসাতে

চাইছেন। তবে হ্যাঁ, কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছি না, এই অভিনব প্রক্রিয়ায় মার্ডার করাটা ডাক্তারের দিকেই আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে। এবং সেটাই সব থেকে বেশী সম্ভব। আর সিগারেটের প্যাকেটটা সেদিন সম্ভাব্য পরবর্তী খুনের উত্তেজনায় ডাক্তারের পক্ষে অজ্ঞাতসারে ফেলে আসাও বিচিত্র নয়। এবং বহু ক্ষেত্রে এই রকম ছোটোখাটো সূত্র থেকেই খুনীকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই সব বাল-সুলভ প্রমাণ দিয়ে ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করা যায় না। আরো নিশ্চিত কিছু চাই।

—কি সেটা ?

—আসল সত্যের জটটা যেখানে পাকিয়েছে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

—কিন্তু মনে আছে, তুই কথা দিয়েছিস এক সপ্তাহের মধ্যেই খুনীকে ধরবি। আমার মনে হয় খুনী কে, এটা বোধ হয় তুই ধরতে পেরেছিস ?

—ধরতে পারি নি। তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ ? অ্যাণ্ড হোয়াই ?

—কিন্তু সময় মোটে এক সপ্তাহ।

—তুই তো জানিস, কথা দিলে কথা রাখার অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই আছে।

আমার বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। নেমে পড়লাম। মুখ বাড়িয়ে নীল বলল—রেখাকে বলিস, একদম তোকে ঠাণ্ডা লাগতে দিই নি।

—তা বলব। কিন্তু তোর প্রেমিকাটি কে ?

—তাও বলব। তবে সময়ে। কাল তৈরী থাকিস। যখন খুশী আসতে পারি।

—কিন্তু কলেজ ?

—গুলি মেরে দে।

পরদিন বারোটা নাগাদ নীল ফোন করল—এক্ষুণি চলে আয়। এক জায়গায় যেতে হবে। একটার মধ্যে আসবি কিন্তু।

একটা বাজার আগেই আমি পৌঁছে গেলাম। দেখি নীল তৈরী হয়েই বসে রয়েছে। কিন্তু গিয়েই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সিম্পল লায়ন আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন।

আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—মানিকজোড়ের মানিকটি ছিল, এবারে ন্যাজ হল যুক্ত।

চিমটি দিতে আমিও ছাড়লাম না—আসলে কি জানেন, আমরা এখনও ব্যাঙাচিই রয়ে গেলাম। ল্যাজ খসে কোলা ব্যাঙ হতে অনেক সময় লাগবে।

—হেঃ হেঃ, ব্যাঙাচির ন্যাজ হওয়ার চেয়ে কোলা ব্যাঙ হওয়া অনেক ভাল।

—ঠিক বলেছেন, এক মাথা চুল থাকার চেয়ে টেকো হলে অনেক সুবিধে। চিরুনি কেনার পয়সা বাঁচে। নাপিতের খরচ লাগে না।

—ভাল হবে না, ভাল হবে না কিন্তু! নীল, দেখো তোমার বন্ধুই হোক, আর যাই হোক, পার্সোন্যাল অ্যাটাক করলে কিন্তু আমি লক-আপে ঢুকিয়ে দোব।

—এই জন্যেই ত চোর গুণ্ডা আর বদমাইশে দেশটা ছেয়ে গেল।

নীল এবার দুজনকেই ধমক দিল—মিঃ সিন্‌হা, বয়সটা আপনার ওর থেকে অনেক বেশী। ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছেন কেন? আর অজু, তুই কি ওঁর পেছনে না লেগে থাকতে পারিস না?

প্রথম আক্রমণটা যিনি করেছেন, কথাগুলো তাঁকেই বল্ না।

—আমি ত আর তোমাকে টেকো বলতে যাই নি।

—আমার কি চালে খড় নেই যে টেকো বলবেন? তা হলে ত আপনাকে কানাও বলতে হয়—

—ছ্যাখ, ছ্যাখ নীল, বয়ঃজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্ভাষণের রীতি দেখ। ছোট লোক।

—ব্যস, ব্যস, খুব হয়েছে। হাত তুলে দুজনকে থামালো নীল— এ বিষয়ে আর একটাও কথা নয়। নিন মিঃ সিন্‌হা, চা খান।

দীনু চা নিয়ে এসেছিল। চা খেতে খেতে পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে নীল বলল—সব কথা তা হলে মনে থাকবে ত মিঃ সিন্‌হা?

—নিশ্চয়ই। তবে আমার মত যদি শোন তাহলে এক্ষুণি আমি ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করি।

—তা হয় না মিঃ সিন্‌হা। আর কটা দিন আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। খুনী হাতে-নাতে ধরা পড়বে। আর তাকে ধরার দায়িত্বটা আপনারই থাকবে। দেখবেন, তখন আবার গণ্ডগোল করে বসবেন না।

—কি যে বল। এই লাইনে থাকতে থাকতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—এ ক্ষেত্রে চুল না বলে টাক পাকানো বলাই ভাল।

—শা-ট্ আ-প—ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। খানিকটা চা আমার সাদা আলোয়ানটায় চল্‌কে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এক্ষুণি এটা দুধ দিয়ে ধুয়ে না দিলে দাগ রয়ে যাবে। সিংহীমশাইয়ের গর্জন তখনও চলছে।

মাসীমার ঘরে মিনিট পনেরো কাটিয়ে যখন ভাবছি এবার গেলে হয়, ঠিক তখনি নীল এসে ঘরে ঢুকল। বলল—নে, চল।

—গ্যাছে?

নীল হেসে ফেলল—সত্যি, তুই পারিসও বটে। এখন দেড়টার মধ্যে পৌঁছতে পারলে হয়।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাবি রে তোরা?

নীল মায়ের কাছে গিয়ে জামার কলারটা পেছন দিকে ঠেলে

দিয়ে বলল—অনিন্দিতা মিত্রের বাড়ি।

—সে আবার কেরে ?

—নাঃ মা, তোমাকে দিয়ে আর চলে না। বড্ড সেকেলে রয়ে গেলে। অত বড় একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেসের নাম শোন নি ?

—ও, তাই বল। আমি ভাবলুম, তুই বুঝি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস।

—আজকালকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারের চেয়ে ফিল্ম আর্টিস্টদের কদর দেয় বেশী।

—তা হবে। তা অনিন্দিতা এখনও অভিনয় করছে ?

—এখনও প্রতি বছর বেস্ট সাইড অ্যাকট্রেসের পুরস্কার পাচ্ছেন।

—বরাবরই ভালো অভিনয় করে। তা তাড়াতাড়ি ফিরিস বাবা। খাওয়া-দাওয়া করে নিয়েছিস ত ? অজু খেয়ে এসেছিস ?

—হ্যাঁ মাসীমা।

বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দালকের দেওয়া কাগজটায় ও একবার চোখ বুলিয়ে নিল। জিজ্ঞেস করলাম—কতদূর ?

বলল—বাঁশদ্রোণী। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেড়টায়।

নীরবে ও গাড়ি চালাচ্ছিল। ভরা শীতের তপ্ত দুপুর। বেশ লাগছিল। হঠাৎ কালকের নীলের অভিসারের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা না জানতে পারা পর্যন্ত মনের মধ্যে অস্বস্তিটা খচখচ করছে। বললাম—বলবি না ত ?

—প্রেমিকার নাম ?

—হ্যাঁ।

—শ্রীমতী মালতি দাসী। বলেই ও হো হো করে হেসে উঠল।

—তুই একটা ছোটলোক। কাল থেকে আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিস।

—তুই-ই বা কি করে ভাবলি, তুই জানবি না অথচ আমি প্রেম

করব? তবে অভিনয় করছি। অনুরাগের। খুব একটা খারাপ পার্ট করছি না। নইলে কি আর পরপর তিনদিন ও আমার সঙ্গে ঘুরতে বের হয়? কাজটা খুব অন্যায় হচ্ছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য। আগাপাশতলা কিছুই বুঝতে পারছি না। দাবার চাল নীল কোন্‌দিকে চালছে, আমার অনুর্বর মাথায় তা ঢুকবে না, যতক্ষণ না ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। তবে কাল সন্ধ্যে থেকে যে অভিমানের ঢেউটা আমার বুকের মধ্যে ফুঁসছিল সেটা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আমার মনটা শরতের আকাশ।

—তা ব্যাপারটা কি একটু বলবি ত? বিশ্বাস কর, কারো কাছে আমি এ সব ফাঁস করব না।

—প্রমিস?

—আচ্ছা, তুই কি মনে করিস তোর কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হলে আমার আনন্দ হবে?

—তবে শোন। মালতিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটাই রহস্যের চাবিকাঠি। ওর চোখমুখে অনেক গোপন কথা লুকিয়ে আছে। মেয়েটাকে মুঠোয় আনতে পারলে পাপড়ি রহস্যের অনেক কিছু জানতে পারা যাবে। কিন্তু কাজটা শক্ত। একটা মেয়ে মনের কথা কার কাছে হুড়হুড় করে বলে ফেলে, জানিস?

—জানি। মনের মানুষের কাছে সে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারে না।

—কারেক্ট। ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটা একটু লঘু ধরণের। হালকা চাপল্য ওর সর্বাঙ্গে জড়ানো। রঙিন হাতছানি উপেক্ষা করার মত মানসিক দৃঢ়তা একদম নেই। এরও একটা কারণ আছে। পরে ভেবে দেখেছি।

ছোটবেলা থেকেই মালতি পরের বাড়ি মানুষ হয়েছে। মা-বাবা

ছিল না। মামা-মামীর কাছে বড় অনাদরে উনিশ-কুড়ি বছর পর্যন্ত কাটিয়েছে। কোন রকমে একজন পাত্র যোগাড় করে ওঁরা মালতির বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু মালতির তাকে পছন্দ হয় নি। ওর আগাগোড়া দুটো জিনিসের ওপর প্রচণ্ড লোভ ছিল। অধিকাংশ মেয়েরই তাই থাকে। খুব সুন্দর দেখতে বর। আর বরের বেশ টাকা থাকবে। কিন্তু যে ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হল, তার এ সব কিছুই ছিল না। ছেলেটা না বলে লোকটা বলাই ভাল। ওর থেকে বয়েসে অনেক বড়। বয়েস নিয়ে মালতি মাথা ঘামাতো না। যেটা ঘামাতো সেটা ত আগেই বলেছি—টাকা আর রূপ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর বয়েসের কদাকার, লেদ মেশিনের মিস্তিরিকে মালতির কেন মনে ধরবে বল?

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল। দারুণ হ্যাণ্ডসাম দেখতে একটা ছেলে, মালতি আমাকে ওর ছবি দেখিয়েছে, তার সঙ্গে ওর ভাব হয়েছিল।

আমি বাধা দিলাম—বিয়ের আগে, না পরে?

—পরে। কিন্তু ধোপে টিকল না। ছেলেটা একটা ফেরেব্বাজ। ওরা যখন গোপনে পালাবার কথা প্রায় পাকা করে এনেছে, সেই সময় একদিন পুলিস এসে ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। স্মাগলিং করার অপরাধে।

এই সব নানান কারণে মালতি যখন বেশ অখুশী, ঠিক সেই সময়ে মেশিনে সামান্য হাত কেটে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেল ওর স্বামী। একদিকে বাঁচল, কিন্তু ঝামেলা হল অন্য দিকে। মামা-মামী আর জায়গা দিলেন না। এখন পেট চলে কি করে? এর বাড়ি, ওর বাড়ি বাসন মেজে, রান্না করে কোন রকমে চালাচ্ছিল। কিন্তু যুবতী বিধবা মেয়ে। মধু থাকলেই মৌমাছি আসবে। কিন্তু মৌমাছিদের কাউকেই ওর পছন্দ হচ্ছিল না। অধিকাংশই চাষাভুষো। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল লাহিড়ী বাড়ির সুন্দর ছেলে সুতনুর সঙ্গে।

আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—সুতনুর সঙ্গে মালতির কি ভাবে যোগাযোগ হতে পারে? সে একজন চার্টার্ড অ্যাকউন্ট্যান্ট।

—বলছি। সে সময় লাহিড়ী বাড়িতে সারাদিন কাজের জন্যে একজন লোকের দরকার পড়েছিল। সুদাম ছাড়া আগে একজন বুড়ি ঝি ছিল। তা সে অক্ষম হয়ে পড়ায় ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়, কাজ ছেড়ে দিয়ে। তাই সুতনু একদিন কথায় কথায় ওদের অফিসের বেয়ারাকে একজন ঝি-এর কথা বলেছিল। সেই সূত্রে মালতি এসে যায়। বেয়ারা লোকটা মালতির দেশের লোক।

—এ ত রীতিমতো গল্প ফেঁদে বসলি রে?

—গল্প শোনালেও সত্যি। মালতি ত এসে হকচকিয়ে গেল। এত বড় বাড়ি। এত প্রাচুর্য। এত সুন্দর খাওয়া পরা। যে স্বপ্ন সে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে। কিন্তু এ সবই ত অন্যের। তোকে আমি আগেই বলেছি, মালতি চটুল স্বভাবের। আর সুন্দর ছেলের দিকে ওর ঝোঁক বরাবরের। ওর দৃষ্টি পড়ল সুতনুর ওপর। আড়ালে আবডালে ছলাকলা আর রসিকতা করতে ছাড়ত না সুতনুর সঙ্গে। আর সুতনুও—

—কিন্তু সুতনুর ত বিয়ে হয়ে গেছে?

— না, তখনও হয় নি। তবে সুতনুর আর্লি ম্যারেজের অন্যতম কারণ সেটাই। পাপড়ির নজরে পড়েছিল মালতির ছটফটানি। মেয়ে-দের চোখে এ সব এড়ায় না। বাবাকে গিয়ে সে সব কিছু জানাল। মালতিকে তাঁরা তাড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে হয়ত সুতনুর কাছে ছোট হয়ে যাবার ভয়ে রামতনুবাবু আর পাপড়ি দুজনে মিলে যুক্তি করে পাপড়ির সুন্দরী বন্ধু শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বিয়ে লাগিয়ে দিলেন। সুন্দরী।শিক্ষিতা বৌ এসে তার স্বামীর সব দুর্বলতা কেড়ে নিল মালতির ওপর থেকে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল বিশেষতঃ পাপড়ির জন্যেই। পাপড়িই প্রথম ওদের দুজনকে এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দেখে ফেলেছিল। তাই মালতির একটা প্রচণ্ড চাপা রাগ জমে ছিল

পাপড়ির ওপর।

—বুঝতে পারছি, সেই কারণেই পাপড়ি হত্যার বিশেষ সক্রিয় পার্ট প্লে করেছিল মালতি।

—হুঁ। তাই। মেয়েদের প্রতিহিংসা স্পৃহা বড় ভয়ঙ্কর। তা সে যাই হোক, মালতি সুতনুকে হারিয়ে বেশ কয়েকদিন একা একা কাটালো। হঠাৎ ওর জীবনে আবির্ভাব ঘটল আর এক পুরুষের।

—সে কি রে? লোকটা কে?

—লোকটা একজন লোক। আর সেই লোকটাকেই এখন আমাদের ধরতে হবে।

—তার মানে, সেও এই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে তোর সন্দেহ?

—পারে, আবার নাও হতে পারে।

—এই তোর এক মহা বিদ্‌ঘুটে দোষ। কেবল হেঁয়ালি করিস।

—বলতে পারিস। তারপর শোন, মালতির চরিত্রের দুর্বলতা আমার প্রথম দিনই নজরে পড়েছিল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও যখন কথা বলছিল, কিছুতেই আর চোখ নামাতো না। অদ্ভুত এক কামনার আবেদন থাকত সেই চাহনিতে। বুঝেছিলাম, ওর দুর্বলতা এখানেই।

—আর সেটাই তুই কাজে লাগালি?

—পরপর পাঁচ-ছ' দিন কাজের অছিলায় ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আর বেশীর ভাগ সময়ে পাপড়ির ঘরে মালতিকে একা ডেকে নানান রকম প্রশ্ন করতাম। উল্টো-পাল্টা। প্রশ্রয় দিতাম অকারণে। এমন একটা ভাব দেখাতাম, যেন আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। যদিও আর একজন পুরুষের সঙ্গে সে সেই সময় যুক্ত ছিল, তবু আমার ছল প্রেমের আবেদন ব্যর্থ হল না। কেন জানিস? কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দুজনের মধ্যে তখন বোধ হয় বিবাদ শুরু হয়ে গেছে। ওর কথাবার্তায় তাই বোঝা যাচ্ছিল।

—বিবাদ কি নিয়ে?

—পরে বলব।

—তারপর?

—পাঁচ দিনের দিন বুঝলাম, ও প্রায় সারাদিনই আমার প্রতীক্ষায় থাকে। ওকে বললাম, রোজ রোজ এভাবে এসে কথা বলা যায় না। চল বাইরে কোথাও যাওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল। বোধ হয় এটাই ও চাইছিল। তার প্রমাণ ত কালই পেলি।

—কিন্তু কাজের কিছু হল?

—আর এখন কিছু বলব না। সব শেষ দৃশ্যের জন্যে তোলা থাক। মনে হয় বাড়ি এসে গেছে।

গাড়ি থামিয়ে নীল একজনকে প্রশ্ন করল—অনিন্দিতাদেবীর বাড়ি কোন্‌টা?

লোকটা হাত দিয়ে সামনেই একটা ছোট্ট সুন্দর সাজানো গোছানো দোতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

বেল বাজাতেই একজন ছোকরা চাকর বেরিয়ে এল। চাকরটাকে বোধ হয় আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল। কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

বাইরে থেকে বাড়িটাকে যতটা সুন্দর লাগছিল, ভেতরটা তার থেকেও অনেক মনোরম করে সাজানো। খুব অল্প জায়গার মধ্যে প্ল্যান করে বাড়িটা তৈরী, দেখলেই বোঝা যায়।

একটু পরেই দোতালা থেকে নেমে এলেন অনিন্দিতাদেবী। বোধ হয় একটু আগেই উনি স্নান-টান সেরেছেন। একটা হালকা পারফিউম সমস্ত ঘরটাকে সুগন্ধে ডুবিয়ে দিল। উনি এসে নীলকে দেখে হাসতে হাসতে পাশের সোফাটাতে বসলেন।

এত সামনে থেকে এর আগে আর কোন অভিনেত্রীকে দেখি নি।

সত্যি কথা বলতে কি, এই বয়সেও কোন মহিলা এত সুন্দরী হতে পারেন আমার জানা ছিল না। প্রায় পঞ্চাশের কাছে ওঁর বয়স। চওড়া কমলা রঙ পাড়ের সাদা টাঙ্গাইল শাড়ি।

চোখ-নাক-মুখ, এই বয়সেও নিখুঁত আর কাটা কাটা। গায়ের রঙটা উজ্জ্বল গৌর। অনেকটা চাঁপা ফুলের মত। কেবল মাথার চুলে কয়েকটা সাদা রেখা এদিক সেদিক উঁকি দিচ্ছে।

উনিই প্রথম কথা বললেন। মনে হল, মিষ্টি সুরে বাঁধা একটা সেতার টুং-টাং আওয়াজ করে উঠল- তুমি কিন্তু একটু দেরি করেছ নীলাঞ্জন।

—হ্যাঁ, একটু দেরি করে ফেলেছি। মিঃ সিন্‌হা এসেই সব গণ্ডগোল করে দিলেন।

—এ ছেলেটি কে বাবা? একে ত—

—আমার বন্ধু এবং ভাইও বলতে পারেন। ও আমার সঙ্গে সব কাজেই থাকে।

মহিলা তেমনি মিষ্টি সুরে হা-হা করে হেসে উঠলেন—ঠিক ডিটেকটিভ বইয়ে যেমন পড়ি। তোমার ওয়াটসন?

নীল বাধা দিল—না, ঠিক তা না। ওর লেখাটেখার বাতিক আছে। তাই আমার সঙ্গে থেকে থেকে লেখার মশলা যোগাড় করছে।

ভদ্রমহিলা এবার আমার দিকে তাকালেন—তুমি লেখো?

—একটু একটু।

—কি কি লিখেছো?

বললাম আমার বইগুলোর নাম। নামগুলো শুনেই উনি বললেন—ওমা, তুমিই সেই অজেয় বসু? আরে, তোমার বই ত আমি কিনেছি। তুমি এতটুকু ছেলে! আমি ত ভাবলাম, বেশ বয়স্ক-টয়স্ক কেউ হবে। লেখো। তোমার হাত ভালো।

এমন সময় এক ট্রে ভর্তি স্ন্যাকস্ আর কফি এলো।

আমরা একটু ইতস্ততঃ করলাম। নীল বলল—এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি। এখন না হলেও চলত।

—বেশ ত, পরেও না হয় আবার হবে। তোমরা আমার ছেলের মতো। লজ্জা-টজ্জা কোর না। মেকানিক্যাল আর ফর্মাল হয়ো না বাবা। জানো ত আমার জগৎটা? কেবল ফর্মালিটিজ আর লোক-দেখানো ভদ্রতার খোলস। সহজ সাধারণ মানুষগুলো এ জগতটায় এলেই কেমন যেন মুখোস এঁটে নেয় মুখে। তখন আর তাদের চেনা যায় না। তোমরা এসেছ। খানিকটা সহজ হয়েই মিশতে দাও তোমাদের সঙ্গে।

নীল আর কিছু না বলেই ট্রেতে হাত চালিয়ে দিল। ইশারায় আমাকেও নিতে বলল। মিনিট খানেক পর অনিন্দিতাদেবীই বললেন—বল নীলাঞ্জন, আমার কাছে তুমি কি জানতে এসেছ?

চানাচুর চিবোতে চিবোতে নীল বলল—এর মধ্যে একদিন উদ্দালক আমার কাছে গিয়েছিল। অনেক কিছুই বলল। ও চায় পাপড়ির হত্যাকারী কে, আমি খুঁজে বের করি। অবশ্য ও না চাইলেও এটা আমার কর্তব্য। আমি করবই। উদ্দালকের কথাটা তুললাম এই কারণে—বর্তমানে ও খুব এলোমেলো আর অস্থির।

উদ্দালকের প্রসঙ্গে অনিন্দিতাদেবীর মুখের চেহারাটা ধীরে ধীরে কেমন যেন পালটে গেল। একটা করুণ বিষণ্ণতা নিয়ে উনি মাথাটা নিচু করলেন। তারপর একটু পরে বললেন—ছেলেটা আর মেয়েটা পরস্পরকে বড্ড ভালবাসত। বিশেষ করে মেয়েটা। তাই ত আমাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়েছিল।

—উদ্দালক কি এর মধ্যে আপনার কাছে এসেছিল?

—নাঃ। আজকাল আর ও আমার কাছে আসে না। আমিও চাই না, ও আমার কাছে আসুক।

—কেন?

—ওর একটা আলাদা জগৎ তৈরী হয়েছে। সেখানে আমার

পরিচয় দিতে ওর বাধবে। তাই আমার কাছে ওর না আসাই ভাল।

—কিন্তু, আজ যে ও বড় একা।

—আমি জানি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

—আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন, তবু বলছি, ও চায় এই জগৎটা দূরে সরিয়ে রেখে আপনি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

উনি ক্ষণিক কি যেন ভাবলেন। তারপর বললে—উদ্দালক আমাকে সে কথা বলেছিল। কিন্তু এসব কথা আমি বিশ্বাস করি না। আবেগ আর সাময়িক উত্তেজনায় মানুষ অনেক কিছু বলে। কিন্তু সেগুলোর স্থায়িত্ব বেশীদিনের না। সারাজীবন ধরে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ঘা খেতে খেতে আমি বড় প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছি নীলাঞ্জন।

—কিন্তু সব ছেলেই ত তার মাকে কাছে পেতে চায়। মা আর ছেলের সম্পর্কে স্বার্থপরতা বা বিশ্বাসঘাতকতা—এইসব প্রশ্ন কি ওঠে?

নীলের দিকে উনি সরাসরি তাকিয়ে বললেন—পৃথিবীকে কতটুকু তুমি দেখেছো নীলাঞ্জন? আমার এখন বাহান্ন বছর বয়স। অন্ততঃ তোমার থেকেও বেশ কিছুদিন আমি পৃথিবীর পুরনো বাসিন্দা। অন্ততঃ তোমার থেকে একটু বেশী আমি দেখেছি। আর অভিজ্ঞতা? এক জীবনে এত অভিজ্ঞতা তুমি কোথা থেকে পাবে নীলাঞ্জন? অনেক ঘাটের জল-খাওয়া মেয়ে আমি। স্বার্থপরতা আর বিশ্বাসঘাতকতা তোমার থেকেও আমার অনেক বেশী দেখা।

—তাই বলে মা আর ছেলের সম্পর্কেও?

ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটিয়ে অন্যমনস্কের সুরে বললেন—বাবার রক্ত যে ছেলের গায়ে থাকে নীলাঞ্জন। সেটা অস্বীকার করা যায় না। তাই ত ছোটবেলা থেকেই উদ্দালককে আমি দূরে দূরে রেখেছি! কাছে থেকেও কাছে আসতে দিই নি। নেহাত পেটের ছেলে, তাই ত্যাগ করে যেতে পারি নি। লেখাপড়া শিখি-

য়েছি। বড় করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত সামর্থ্য তৈরি করে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছি। এতে অন্যায় কোথায় বল ?

—কিন্তু ও যে ওর মাকে কোনদিন পেলো না। বাবাকেও না।

—পৃথিবীতে বাবা-মা হারা ছেলে অনেক আছে। ও ত তবু কোনদিন অভাব বোঝে নি। কিন্তু আর পাঁচটা ছেলের তাও জোটে না। সেদিক থেকে ও ভাগ্যবান।

অনিন্দিতাদেবীকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই ত একটু আগেই কত মিষ্টি করে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওঁকে তখন কত ঘরোয়া আর মমতাময়ী মনে হচ্ছিল। কিন্তু ছেলের প্রসঙ্গ আসতেই কেমন যেন কঠোর হয়ে উঠলেন। এক অনমনীয় জেদের প্রভাবে মুখের শিরাগুলো কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু কেন ? এ কি বিজাতীয় বিদ্বেষ ? তাও অন্য কেউ না। নিজের সন্তান। এ হয় ? এমন হতে পারে আমার ধারণায় ছিল না। সত্যিই পৃথিবীতে যে কত মানুষ রয়েছে। কত যে তাদের চরিত্রের বিচিত্র গতিবিধি। তবে পৃথিবীতে কোন কিছুই কারণ ব্যাতিরেকে ঘটে না। সবের পিছনেই একটা অনিবার্য কারণ থাকে। ছেলের প্রতি এই যে জমে থাকা এত বিদ্বেষ, নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ আছে। অতীতের কোন ঘটনার জেরও হতে পারে। কিন্তু কি ?

হঠাৎ নীলকে প্রশ্ন করতে শুনলাম—সুরঞ্জন মিত্র কি বেঁচে আছেন ?

—জানি না। কিন্তু তুমি কোথা থেকে এ নাম শুনলে ?

—উদ্দালকই বলেছে। কিছু মনে করবেন না, আমি কোন খারাপ ইঙ্গিত নিয়ে প্রশ্ন করছি না। সুরঞ্জন মিত্রই ত উদ্দালকের বাবা ?

—কোন সন্দেহ নেই তাতে। ধর্ম সাক্ষী করে সুরঞ্জন আমাকে বিয়ে করেছিল। উদ্দালকের জন্মে কোন পাপ নেই।

নীল মাথা নিচু করে বলল—আমি সে কথা বলি নি। আমি

কেবল সত্যটুকু জানতে চেয়েছি। কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন, তাঁর কোন খবর আপনি রাখেন নি কেন, এগুলো যে আজ উদ্দালকের জীবনে অনেক বড় প্রশ্ন। জানি, এ সব আপনার ব্যক্তিগত কাহিনী। বলতে পারেন, একান্ত গোপনীয়। আমি একটা বাইরের ছেলে। আমার কাছে আপনার এসব প্রকাশ করার ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকতে পারে। তবু পাপড়ি নামের একটা নিষ্পাপ মেয়ে খুন হয়েছে, এটা মনে রাখবেন। একটা সহজ সরল ছেলের জীবন নষ্ট হতে বসেছে। এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, একটা ছেলের মরুভূমির মত রুক্ষ জীবনে যে মেয়েটা একটু শান্তির ছোট্ট ফুল ফোটাতে চেয়েছিল, সেই মেয়েটাকে যে খুন করেছে, তার শাস্তি হওয়া উচিত।

—আমি ত তা অস্বীকার করছি না। পাপড়ি বড় ভালো মেয়ে ছিল। তাই ত আমিও চেয়েছিলাম, উদ্দালকের জীবনে মেয়েটা আসুক। উদ্দালককে আমি যা দিতে পারি নি, পাপড়ি তাই দিক। কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল। পাপড়ির হত্যাকারী ধরা পড়ুক, সে আমিও চাই। কিন্তু পাপড়ির হত্যার সঙ্গে আমার বা সুরঞ্জনের জীবনের পুরনো কাহিনীর কি সম্পর্ক, তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি শেষে আমাকেই সন্দেহ করে বসলে?

—না। এই হত্যাকাণ্ডে আমি উদ্দালক আর আপনাকে সন্দেহ করি নি একবারও। তবে পাপড়ি হত্যা-রহস্যের সঙ্গে আপনারাও পরোক্ষে জড়িয়ে আছেন, সেটা ত অস্বীকার করতে পারেন না? একটা খুনকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমাদের একটু খুঁটিয়ে দেখতে হয়—কখনও কখনও ব্যক্তি-জীবনের অতীতকেও হাতড়াতে হয়। তাই একান্ত আপত্তি না থাকলে আপনি আমায় সব বলুন। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, বিশেষ প্রয়োজন না হলে এসব কথা বাইরের কেউ জানবে না।

প্রায় মিনিট দুয়েক অনিন্দিতাদেবী কোন কথা বললেন না। এই দু মিনিট সময় বড় কম না। মনে হচ্ছে যেন একটা যুগ। আর সেই

অন্য এক যুগের ওপার থেকে ধীরে ধীরে কথা শুরু করলেন অনিন্দিতা-দেবী—তোমাকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন আসছে না। বাইরের লোক জানলেও আমার কিছু এসে যায় না। কারণ আমি আজ তোমাদের তথাকথিত সমাজের বাইরের লোক। এসব কথা কাউকে কোনদিন বলি নি, বলার প্রয়োজন মনে করি নি বলে। আর স্মরঞ্জনকে খুঁজি নি। খুঁজে লোকটাকে মূল্যবান করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এখন ওর নামটা মুখে আনতেও আমার ঘেন্না করে। যৌবনের অনেক নোংরা ইতিহাস আমার বুকে জমে আছে। কিন্তু নোংরামির এক পুকুর কলঙ্কে আমায় ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সুরঞ্জন মিত্র নামের একজন ডিবচ্।

লোকটা একটা বেইমান। আসলে কি বললে লোকটার সত্যিকার পরিচয় দেওয়া যায়, তা এখনও অভিধানে খুঁজে পাই নি।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামলেন অনিন্দিতাদেবী। বোধ হয় অতীতটাকে খুঁজে বার করতে চাইছেন। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলেন—অথচ একদিন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম সুরঞ্জনকে। ও বললে সে সময় আমি ওর জন্যে মরতেও পারতাম। আজ ভাবলে মনে হয়, কি বোকাই না তখন ছিলাম। আসলে মানুষ না ঠকলে বোধ হয় মানুষকে চিনতে পারে না।

গরীব বাবার তিন মেয়ে আমরা। আমিই বড়। অনিন্দিতা আমার আসল নাম নয়। ওটা সুরঞ্জনেরই দেওয়া নাম। আগে আমার নাম ছিল শিখা। আগুনের শিখার মত ছিল আমার রূপ। যে এক-বার তখন আমায় দেখত, সেই আমার রূপে মুগ্ধ হত। এ নিয়ে যে আমারও কিছু গর্ব ছিল না, তা নয়। লোকের মুখে শুনতে শুনতে আমার মনেও কেমন যেন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল, বিয়ের জন্যে আমার কোনদিন ভাবতে হবে না।

কিন্তু কথায় বলে, অতি বড় সুন্দরী, না পায় বর, কে জানতো আমার অবস্থা তেমনিই দাঁড়াবে? তেইশ-চব্বিশ বছর পর্যন্ত দেখা-

দেখিই হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। আমার তখনকার ছেলেমানুষী গর্বিত মনে একবারও মনে হয় নি, মেয়েদের বিয়ে হতে গেলে ছুটো জিনিসের বড় দরকার এই বাংলাদেশে। একটা রূপ আর একটা অর্থ। রূপটা আমার ছিল। টেস্টে পাস করে যেতাম। আটকাতো ফাইন্যালে। আমার বাবা সামান্য অফিসের সামান্যতম কেরানী ছিলেন। যা মাইনে পেতেন, কোন রকমে তিন মেয়ে এক ছেলে আর আর আমাদের রুগ্না মাকে সারা মাস চালিয়ে অবশিষ্ট থাকত মোটা ধার। ধারটা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। এই অবস্থায় মেয়ের বিয়েতে খরচ করার মত টাকা কোথায়?

বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সামান্য কিছু টাকা জমেছিল। তখনকার দিনের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আজকের মত নয়। এখন যেমন তোলাতুলির অনেক ঝামেলা, তখন তা ছিল না। চাইলেই ফেরত পাওয়া যেত। আর সেই টাকা দিয়েই মায়ের শুশ্রূষার কাজ চলছিল। কিন্তু ব্যাঙের আধুলি শেষ হতে আর ক'দিনই বা লাগে? শেষে মাইনের টাকায় হাত পড়ল। এমন অবস্থায় এল, যখন ধার পাওয়া যায় না বাইরে কোথাও। কোন রকমে দশ দিন চলার পর অচল অবস্থা।

বিয়ের ভাবনাটা প্রায় চলেই গিয়েছিল। রূপের থেকে পাত্রপক্ষ টাকার বায়না ধরত বেশী। রূপটা নাকি ছু-দিনের। টাকাটাই সব। আগে তবু মাঝে মাঝে বিয়ের কথাবার্তা হত। দেখাদেখি হত। শেষের দিকে ওসব বিলাসিতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বাবা মারা গেলেন। স্ট্রোক। আমাদের কিছুই করার ছিল না। পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া।

হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এল কিছু টাকা রোজগারের। পাশের বাড়ির একটি ছেলে, ছেলেটা বোধ হয় মনে মনে আমাকে পছন্দ করত। নামটা আজ ভুলে গেছি। আমার মায়ের কাছে গিয়ে বলল—আজকাল মেয়েরা হামেশাই থিয়েটারে নামছে। মেয়েকে থিয়েটারে নামালে সংসারের সুরাহা হবে। মা প্রথমে অত কষ্টের

মধ্যেও আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি শুনি নি। পেট বড় শক্ত ঠাঁই। মান-ইজ্জত তখন মনে থাকে না। নাম লেখালাম স্টেজের খাতায়।

সেই শুরু। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। ইচ্ছে ছিল পরের বোন দুটোকেও ঐ লাইনে নামিয়ে দেব। কিন্তু কোথা থেকে এসে জুটল সুরঞ্জন মিত্র। আমার পার্ট-টার্ট দেখে গ্রীনরুমে এসে খুব বাহবা-টাহবা দিয়ে চলে গেল। তারপর সাত দিন কাটে নি, আবার এসে হাজির হল। একেবারে আমার বাড়িতে।

সুরঞ্জনকে আমার ভাল লেগেছিল। দেখতে শুনতে বেশ। তার ওপর মিষ্টি অমায়িক ব্যবহার। আসা-যাওয়াটা বেড়ে গেল। স্টেজ থাকলে অভিনয়ের শেষে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত। নইলে সারা-ক্ষণই আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিত। শেষকালে এমন হল ও যেন ঘরেরই ছেলে। যখন খুশী আসত, যখন খুশী চলে যেত। আর দু' হাতে টাকাও খরচ করত। প্রথম প্রথম আমার আপত্তি ছিল। শেষে একদিন মায়ের সামনেই আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানালো। মা ত এক কথাতেই রাজী! এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। তার ওপর পয়সাকড়িও আছে। যেচে এসে নিখরচায় বিয়ে করতে চায়। কোন্ মা রাজী না হবেন। তা ছাড়া আমারও বয়স বেড়ে যাচ্ছে। তখনও আইবুড়ো দু' বোন, এক নাবালক ভাই। সুরঞ্জনের দৌলতে আমার ভাই আবার লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিল।

এই সময় নীল একবার কথা বলল—সুরঞ্জনবাবুকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি ছিল না ত?

—না নীলাঞ্জন, বরং মনে মনে আমি ওকে ভালোই বেসেছিলাম। আর ওর মধ্যে কোন ছলচাতুরী কিছু দেখি নি।

—উনি থাকতেন কোথায় বা কি কাজ করতেন কিছু জেনেছিলেন?

—হ্যাঁ, জেনেছিলাম। পাট না কিসের ব্যবসা ছিল। বাড়িঘর কিছু ছিল না। সংসারে ও একা। থাকত একটা মেসে।

—তারপর কি হল বলুন?

—বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্টেজ নিয়ে মুশকিল। বিয়ের পর আমি যদি স্টেজ নিয়ে পড়ে থাকি, তাহলে সুরঞ্জনের দেখাশুনো করব কখন? আবার স্টেজ যদি ছেড়ে দিই, তাহলে সংসারের কি হাল হবে? সমস্যার সমাধান করল সুরঞ্জন নিজে। বলল—তার দিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি স্টেজে যেমন যাচ্ছি তেমনি যাব।

একদিন বিয়ে হয়ে গেল। ধুমধাম করে না। অতি সাধারণ-ভাবে। ধুমধাম করার ইচ্ছে সুরঞ্জনের ছিল না। আর আমাদের ত অবস্থাই ছিল না। স্টেজের পয়সা সংসারেই খরচ হয়ে যেত।

ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি সহজ হয়ে এল। কিন্তু জীবনটা যে সহজ নয়, কিছুদিন পরেই তা বুঝলাম। বিয়ের পর মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম সুরঞ্জনকে। বিয়ের আগে সুরঞ্জন যেমন দিনরাত বাড়িতে পড়ে থাকত, বিয়ের পর হল উলটো। তখন সারাদিন বাইরে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরত। জিজ্ঞাসা করলে বলত ব্যবসা মন্দা চলছে। নানান জায়গায় খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত। নিজেকেই দোষী ভাবতাম। আমার জন্যেই ওর এই অবস্থা হল। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ও নিজেকে জড়িয়ে নিজের দুর্ভাগ্য টেনে আনল।

হঠাৎ একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল। মুখে মদের গন্ধ। চমকে উঠলাম, সুরঞ্জন মদ খেয়েছে! জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বলল—তার ইচ্ছে সে খেয়েছে। নিজের পয়সায় সে যা খুশি তাই করতে পারে। চুপ করে গেলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম, ওর হাতে এখন পয়সাকড়ি নেই, তাই মদ খেয়ে ভুলতে চাইছে। চুপ করেই থাকতাম। কিন্তু থাকতে দিল না। ধীরে ধীরে ওর ভদ্রতার মুখোসটা কখন সরে গেছে টের পাই নি। একদিন এসে নেশা করার টাকা চাইল।

সুরঞ্জন জানে, আমাদের কি ভাবে দিন কাটে। এর মধ্যে ওকে

কোথা থেকে টাকা দেব? মাস মাইনের স্টেজ। গোনা-গুনতি পয়সা। ওকে দেওয়া মানে, সংসার চালানোর অসুবিধা। তবু দিতাম। একদিন আমাদের সংসারের জন্যে অনেক খরচ করেছে ত।

কিন্তু চাওয়াটা থেমে রইল না। দিন দিন বেড়েই চলল। শেষকালে একদিন বাধ্য হয়েই বলতে হল—টাকা আর নেই। শুরু হল অত্যাচার। মারধোর। এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ একদিন সুরঞ্জন বাড়ি ফিরল না। আমি ত সারা রাত ভেবেই আকুল। গেল কোথায়? তার ওপর তখন আমার পেটে এসেছে উদ্দালক।

নীল জিজ্ঞাসা করল—উদ্দালকের কথা সুরঞ্জন জানতেন?

—হ্যাঁ জানত। বড় ভাবনায় পড়ে গেলাম। পরের দিন সকাল গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যেও গেল। সারা রাতেও সুরঞ্জন ফিরল না। প্রায় এক মাস পর হঠাৎ এসে হাজির হল। খোড়ো উসকো-খুসকো চেহারা। এসেই বলল—তার এখনি দশ হাজার টাকা দরকার। যেমন করেই হোক দিতে হবে। কতটা অমানুষ হলে মানুষ এ অবস্থায় টাকা চাইতে পারে, অতদিন পর ফিরে এসে, তা কেবল সুরঞ্জনই বলতে পারত। খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম, দশ-হাজার? আমি কোথা থেকে পাব?

উত্তরে বলেছিল—না পাবার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা করে এসেছি। তোমাকে এবার থেকে রতন হালদারের কাছে থাকতে হবে। বিনিময়ে সে আমাকে দশ হাজার টাকা দেবে।

রতন হালদার কে, তা আমি জানতাম না। পরে জেনেছিলাম, রতন হালদার টায়ারের ব্যবসা করে। স্টেজে আমাকে দেখে নাকি আমার প্রেমে পড়ে গেছে। সে আমাকে পেতে চায়। তার জন্যে যা খরচ, সব করতে রাজী।

সুরঞ্জনকে বলেছিলাম—তাই তুমি সেই লম্পটের হাতে আমায় তুলে দিতে চাও?

তার উত্তরে, বুঝলে নীলাঞ্জন, সুরঞ্জন বলেছিলো—থিয়েটারের

মেয়ে কতদিন আর এক বাবুর কাছে থাকবে? মাঝে মাঝে বাবু পালটাতে হয়।

লজ্জায় ঘেন্নায় আমার তখন মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো। নেহাত পেটে তখন উদ্দালক। নইলে আজ তোমরা আমার সামনে বসে কথা বলতে পারতে না।

সুরঞ্জনের প্রকৃতি বুঝতে তখন আমার আর বাকি ছিল না। কিছুদিন আমাকে ভোগ করতে চেয়েছিল। এমনিতে পেতো না। তাই লোক দেখানো একটা বিয়ের নাটক করেছিল। নেশা কেটে যেতে আমার কাছ থেকে টাকাপয়সার অভাব দেখিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিলো। কিন্তু সুরঞ্জন যেমন নারীলোভী, তেমনি অর্থপিশাচ। তাই মোটা দাঁও দেখে রতন হালদারের হাতে আমাকে বিক্রি করে হাজার দশেক টাকা লুটবার মতলবে ছিল।

নীল এবার জিজ্ঞাসা করল—আপনি সুরঞ্জনবাবুকে কিছু বললেন না?

—পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম। বলেছিলাম—অভাবের জন্যেই আমাকে থিয়েটার করতে হয়। তার বেশী কিছু নয়। মনেপ্রাণে তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি আমার স্বামী। তোমার ছেলে আমার গর্ভে। তোমার মুখ থেকে এসব কথা আমার শোনাও পাপ। আর আমি কোনদিন থিয়েটার করব না। চল, আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই।

একটা চোর হয়ত কখনো-সখনো ধর্মের কথা শোনে, কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের নামে চিরদিনই কালা। বিশ্রী হাসি হেসে সুরঞ্জন বলেছিল—তুই যাবি না, তোর বাপ যাবে। টাকা আমি পেয়ে গেছি। বলেই পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে দেখালো। তারপর বলল—রতন হালদারের লোক এসে কালই তোকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। না যদি যাস, তোর বোন দুটো রেহাই পাবে না। একদিন সকালে উঠে আর ওদেরও দেখতে পাবি না।

মরিয়া হয়ে বলেছিলাম—কিন্তু, তোমার ছেলে যে আমার পেটে রয়েছে ? শয়তানটা তার উত্তরে বলেছিল। রতন হালদার সব জানে। ওর হাতে ডাক্তার আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই পর্যন্ত বলে অনিন্দিতাদেবী থেমে গেলেন। অনেকক্ষণ আর কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উনি কাঁদছেন। মুক্তোর মত ফোঁটাগুলো টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ পর নীল বলল—এর পরের ইতিহাস আর আমার জানার ইচ্ছে নেই। প্রয়োজনও নেই। কিন্তু সুরঞ্জন মিত্র কি আর কোনদিন আপনার কাছে এসেছিল ?

—না।

—আপনি তাকে খুঁজলেন না কেন ?

—কি করব খুঁজে ? আমার কাছে তার অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, তা সে কোনদিন বোঝে নি। সে কেবল বুঝেছিল—তাকে আর আমার কিছু দেওয়ার নেই। এর পরে, কি লাভ তার খোঁজ করার ?

—অন্ততঃ একবারও মুখোমুখি দাঁড়াবার ইচ্ছেও কি নেই ?

—না।

স্পষ্ট এবং দৃঢ় জবাব। তারপর বললেন—রতন হালদার লোকটা আর যাই হোক, শয়তান নয়। ওই আমাকে ফিল্মে সুযোগ করে দিয়েছিল। আমার একান্ত আপত্তির জন্যে উদ্দালককে ও নষ্ট করেনি। বরং আমাকে ও রাণীর সুখে রক্ষিতা হিসেবে রেখে দিয়েছিল।

—এসব কথা থাক। সুরঞ্জনবাবুর কোন ফটো আপনার কাছে আছে ?

—কি করবে ? খুঁজে বার করবে তাকে ?

স্মিত হেসে নীল বলেছিল—ক্ষতি কি খুঁজে পেলে ? একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে যদি কোন ছেলে তার হারিয়ে যাওয়া বাবা মাকে ফিরে পায়, তাহলে সেই উপরি মানসিক পরিতৃপ্তিটা আমার উপরি

পাওনা হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিন্দিতাদেবী বললেন—তুমি তাকে চেনো না। তাই এমন কথা ভাবতে পারছ। আমি বুঝতে পারছি, উদ্দালক তোমাকে নাড়া দিয়েছে। ভালোই। খুঁজে দেখব। যদি পাই দেব।

—ধন্যবাদ। আজ তাহলে উঠি।

বেরিয়ে আসছিলাম। উনিও পেছন পেছন আসছিলেন এগিয়ে দিতে। হঠাৎ নীল থেমে পড়ে বলল—ছোট মুখে হয়তো বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, তবুও আমি আপনার ছেলের মত, সেই হিসেবেই বলছি, ঠিক খুনের তদন্ত নয়। উদ্দালকের জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। যদি পারেন, উদ্দালকের কথাটা একবার ভেবে দেখবেন। চিরদিন সে তার মাকে চেয়েছে। পায় নি। আজও চায়। পাচ্ছে না। বাবার অপরাধে ছেলে কেন শাস্তি পাবে? সুরঞ্জনবাবুর ভুলটা আপনিও করবেন? এক জীবনে এত অভিজ্ঞতা নিয়েও আবার ভুল করা?

নীল বেরিয়ে এল। আমিও। গাড়িতে উঠতে উঠতে দেখলাম, দরজার কপাটে মাথা ঠেকিয়ে অনিন্দিতাদেবী তখনও দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে চার দিন কেটে গেল। আগে প্রায় সাড়ে সাতটার আগে আমার ঘুম ভাঙত না। ইদানীং খুব ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। সেটা অবশ্য এই জটিল কেসটার জন্যে না। ভুবনবাবুর পড়শীদের-ঘুম-ভাঙ্গানো মোরগটার জন্যে। ঘুম ভেঙ্গেই প্রতিদিন দেখি, মোরগটা যেন দিনে দিনে শশীকলার মত গতরে ফুলছে। আর ফুলবে নাই বা কেন? এ ত আর কসাই-এর মোরগ না। কসাই-এর মোরগগুলো বোধ হয় বুঝতে পারে, তাদের অন্তিমকাল আসন্ন। তাই যতই তাকে ভুষি আর ধান খেতে দেওয়া হোক, মৃত্যুর পথ চেয়ে চেয়ে সে ক্রমশঃ কমতে থাকে। সেটা ভয়ে আর ভাবনাতেও হতে পারে। তবে আমি

একটা অন্য ব্যাখ্যা মনে মনে খুঁজে পেয়েছি। ওরা মৃত্যুর আগে শেষ প্রতিশোধ নিয়ে যায়। না ফুলে কসাইকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করাই বোধ হয় ওদের শেষ বাসনা।

কিন্তু ভুবনবাবুর মোরগের কোন দুশ্চিন্তা নেই। তা ওর ঘাড় গলা ফোলানো উর্ধ্বমুখ কণ্ঠনিনাদ শুনলেই বোঝা যায়। আর দুশ্চিন্তা নেই বলেই যা খুশী খাচ্ছে, আর তাতেই মোটা হচ্ছে।

ভুবনবাবু যে কাজটা খুব ভাল করছেন না, তা অচিরেই টের পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ ইতিমধ্যে পাড়ার কোন দস্যি ছেলের নজরে ও যদি না পড়ে থাকে তাহলে নির্ঘাত নীলকে একদিন ডেকে নিয়ে এসে বগলদাবা করে নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে স্পেশাল রোস্ট বানাব। নীল এত জাঁহাবাজ খুনী আসামী পাকড়াও করে, আর সামান্য এক মোরগ পাকড়াও করতে পারবে না? আলবৎ পারবে। এ বিশ্বাস আছে। আর নীল পাখির মাংস রাঁধেও খুব ভাল।

শুয়ে শুয়ে এইসবই ভাবছিলাম। এর থেকে গভীর ভাবনা আমার মাথায় তেমন খেলে না। ইদানীং কোন উপন্যাসের ভালো প্লটও পাচ্ছি না। যাই ভাবতে যাই, মনে হয় এ সব কিছুই লেখা হয়ে গেছে। আসলে বোধ হয় নতুন কোন কাহিনীর জন্ম হচ্ছে না। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে মাত্র। আর আমরা সব লিখিয়েরা যে যার নিজের নিজের ভাষা আর ভঙ্গীতে সেগুলো লিখে-টিখে কেতাদুরস্ত নকলনবিশ সাহিত্যিক হয়ে উঠছি। এ সেই ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বট্‌ল হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অধিকাংশ গল্প উপন্যাসই পড়া শেষে মনে হয়, সব কথা বলা হয়ে গেছে। নতুন আর কিছুই নেই।

এর থেকে ভুবনবাবুর মোরগ নিয়ে চিন্তা করা অনেক ভাল এবং ভাবী খাদ্যলাভের আশায় মানসিক পুষ্টি আসে। নীলের কথামত আর মাত্র তিন দিন বাকি। তার পরেই ও বলেছে পাপড়ির হত্যা-

কারীকে ধরবে।

ওর দেওয়া সময়টাকে ধ্রুব সত্য মেনে নিলে আগামীকাল রবিবার থেকে নীল ফ্রী। এবং নিশ্চয়ই তারপর ও ব্যাঙ বাদুড় না হোক, নিদেনপক্ষে ভুবনবাবুর এই লোভনীয় মোরগটিকে গেলার প্রস্তাব ঠেলতে পারবে না। অর্থাৎ রবিবার সকালেই ও নীলের হাতে বন্দী হচ্ছে। রবিবারের কল্পিত ভোজটির আশায় আবার আমার জানলার কপাটে বসে থাকা ব্রাউন রঙের চিড়িয়াটিকে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে থাকলাম। এমন সময় প্রায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার মত নীল 'ইউরেকা' ইউরেকা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকল। এত ভোরে ওর আবির্ভাব দেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। তার মানে, ওর হাবভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ঘটনা দ্রুত সমাপ্তির পথে!

আমি বললাম—ব্যাপার কিরে? এই সাতসকালে 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' বলে চ্যাচাচ্ছিস কেন? আর্কিমিডাসের মত কোন কিছু আবিষ্কার করে এলি নাকি?

—ঠিক তাই রে। মনে মনে যে সন্দেহটা তিন-চার দিন ধরে মাথার মধ্যে ঘুরছিল, কাল রাত্রেই তা সল্‌ভ হয়ে গেছে। এইবার—

—এইবার কি? হাতে-নাতে ধরা ত?

—কিন্তু ফাঁদ পাততে হবে। নইলে ঘুঘু ফুড়ুৎ।

বিছানা থেকে উঠে লেপটাকে বেশ করে গায়ে জড়িয়ে জুত করে বসে বললাম—তাহলে এবার গুছিয়ে বল, তিন-চার দিনে কি করলি?

নীল ক্ষেপে গেল—দূর হতচ্ছাড়া, গুছিয়ে বলার সময় কি এখন আছে নাকি? এক্ষুণি বেরুতে হবে। অনেক জায়গায় যাবার আছে। ওঠ্ ওঠ্।

বলেই ও আমার গা থেকে লেপ ছাড়াবার উপক্রম করল। হাঁই-হাঁই করে উঠলাম আমি—খবরদার ও কাজটা করিস নি। এক্ষুণি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তার আগে ঐ চাদরটা দে।

ঘরের কোণে চেয়ারের ওপর থেকে চাদরটা আমার হাতে দিয়ে

বলল—দেরি করার আর এক মুহূর্ত সময় নেই।

—একটু চা-টা খাবি ত ?

—তা খেতে পারি। কিন্তু বেশী দেরি করা যাবে না। ভোর না হতেই বেরিয়েছি তোর সঙ্গে খোসগল্প করার জন্যে নিশ্চয় নয়।

চাদর জড়িয়ে বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললাম—কাজের মানুষ তোরা। সময় কোথা সময় নষ্ট করার। সামান্য কিছু হিণ্ট্‌সও দিবি না ?

—নো, নাথিং। কোন কিছুই এখন জিজ্ঞাসা করবি না। কেবল দেখে যাবি, কি করছি, না করছি।

—মানে, লক্ষ্মণের ফলটি ধরে তোমার পিছন পিছন আমায় টো-টো করতে হবে।

—তোকে সঙ্গে রাখছি কেন জানিস, পাপড়ি হত্যা নিয়ে একটা দারুণ লেখা হয়ে যাবে। এই জন্যে তোর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অবশ্য তুই আবার কি লিখবি কে জানে ; লেখা শেষ করে আমায় দেখিয়ে নিস্‌।

—অহংকারটা বেড়েছে দেখছি। এই গর্বের জন্যেই তুই একদিন মরবি।

—আরে মরণ তো সবারই হবে। তা বলে গর্ব করার সুযোগটা নষ্ট করে কোন্‌ পাগলে ? যা যা, আর মেলা বকিস না। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে চলে আয়। আমি ততক্ষণ কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিই।

আধ ঘণ্টার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পিছু ডাকল ভুবনবাবুর অবলা জীবটি। একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাকে দাঁড়াতে দেখে নীল বলল—কিরে, দাঁড়ালি কেন ?

মোরগার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম—জিনিসটা কেমন বল্‌ ত ?

—বেওয়ারিশ ?

—না, বিরক্তিকর। চোর বা খুনী ধরায় তুই আজকাল বেশ পোক্ত হয়েছিস—ওটাকে ধরতে পারবি না?

পিঠে এক থাপ্পড় কষিয়ে বলল—খুনী ধরা আর মোরগ ধরা এক হল?

বললাম—ওটাও একটা খুনী। রোজ আমার ভোরের ঘুমটাকে খুন করে।

—পোষা নাকি?

—হ্যাঁ। ভুবনবাবুর।

—ভুবনবাবুর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। লোকটা বোধ হয় কোন অফিসের কেরানী, তাই না?

—হ্যাঁ।

—হতেই হবে। খোঁজ নিয়ে দেখিস, আগে লোকটার নিশ্চয়ই রোজ অফিসে লেট হত। ভোর ভোর ঘুম থেকে ওঠার জন্য মোরগটা পুষেছে।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। ও আমাকে ঠেলে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

গাড়িতে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম—এদিকটা ত একদম ভাবি নি। ভুবনবাবুকে সত্য ঘটনাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে ত নীলকে অসাধারণ বলতে হবে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় শ্রীধর বাইলেনের একটু দূরে এসে গাড়িটা থামল। গলির থেকে বেশ একটু দূরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে গাড়ির মধ্যেই বসে রইলাম। নীল আগেই বলে রেখেছিল, যা করব, একটাও প্রশ্ন না করে কেবল দেখে যাবি। কোন প্রশ্ন নয়। কোন কৌতূহল নয়।

এমন কি, গাড়ি থামতেই আমি যখন নামতে যাচ্ছিলাম, নীল

কেবল বলল—নামতে হবে না।

প্রশ্ন মনে এসেছিল, 'কেন'? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল নিষেধাজ্ঞা। চুপ করে বসে রইলাম।

মিনিট পাঁচেক পর নীল আবার ঘড়ি দেখল, বলল দেরি করছে কেন? সাধারণতঃ দেরি হয় না ত?

কে দেরি করছে, কার আসার কথা কোন কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্ধকারে বোকার মত চুপ করে বসে থাকলে যেমন হয়, আমার অবস্থা ঠিক তেমনি। কিছুই জানছি না, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। হঠাৎ নীল বলে উঠল—যাক বেরিয়েছে, নে চল। তুই কিন্তু কোন কথা বলবি না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, স্যুট কোট টাই পরে সুতনু লাহিড়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা অ্যাটাচি। দেখলেই মনে হবে, অফিস যাচ্ছে।

আমি আর নীল আনমনে এগিয়ে চলেছি। যেন সুতনুকে আমরা কেউই দেখি নি। সামনাসামনি আসতে সুতনুই প্রথম আমাদের দেখল।

মৃদু হেসে কাছে এসে বলল—আপনারা এদিকে এ সময়ে?

নীল বলল—হ্যাঁ, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। বেরুচ্ছেন নাকি?

—অফিস যাচ্ছি। এখন রোজই এ সময় বের হই। গাড়িটা কয়েক দিন হল গ্যারাজে রয়েছে। নইলে সোওয়া ন'টা নাগাদ বের হলেই চলে।

আফসোসের সুরে নীল বলল—ইস্, তাহলে ত এ সময়ে আসা উচিত হয় নি?

—না, না। ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। একদিন অফিসে একটু দেরি হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি।

—বাড়ির মধ্যে যাবার দরকার নেই। চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই বলা যাবে।

তিনজনে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। বাস-স্ট্যাণ্ড একটু দূরেই। বোধহয় উনি বাসেই যাবেন। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রকম বুঝছেন মিঃ ব্যানার্জী?

—সেই জন্যেই ত সাত সকালে আপনার কাছে আসা।

--বেশ ত, বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

আমার জন্যে কিছু করতে হবে না, যা করবেন সব আপনাদের নিজেদের জন্যেই। তবে এই মুহূর্তে আপনার কাছে আসার আমার একটাই উদ্দেশ্য। কয়েকটা ছোটখাটো ইনফরমেশান আমার দরকার।

—কোথাও একটু বসলে হত না?

—কিছু দরকার নেই। তু' একটা মাত্র প্রশ্ন। মালতি মেয়েটা কেমন?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট দেখলাম, সুতনুবাবুর সুশ্রী মুখে কে-যেন কালি লেপে দিল। হঠাৎ হতচকিত এবং বিব্রত হয়ে পড়লে যেমন দেখায়। কিন্তু চতুর এবং বুদ্ধিমান সুতনু নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল—কেন বলুন ত, হঠাৎ এ সময়ে এই প্রশ্ন?

—কারণ আছে। বলছি। কিন্তু মেয়েটা কেমন?

—মানে, ইয়ে, তেমন সুবিধের নয়।

—ওকে বিশ্বাস করা যায়?

—কি ব্যাপারে?

—তাহলে আপনাকে খুলেই বলি—আজ রাত্রে ও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে সুতনু প্রশ্ন করল—সেকি! কেন?

—ও নাকি জানে কে খুনী? সেই নামটা আমাকে আজ রাত্রেই জানাবে। আরও অনেক কিছু পারিবারিক কথা ও জানাতে চায়।

—ও কি করে জানল?

—ও দেখেছে খুনীকে খুন করাব সময়।

—তাহলে এতদিন বলে নি কেন ?

—পুলিসের ভয়ে।

—অথচ আপনাকে বলতে পারছে ?

—আমি ত আর পুলিস নই।

—ও! তা রাত্রে কেন ?

—হয়ত ওটাই ওর পক্ষে সুবিধের। কিন্তু আমি ভাবছি, অত রাত্রে একজন যুবতী মেয়ের কাছে আসা কি উচিত হবে ?

নীল যেন বড্ড ভয় পেয়ে গেছে এই রকম ভাব করে বলল—বুঝতেই ত পারছেন ব্যাচিলার ছেলে। অজানা, প্রায় অচেনা একজন সোমত্ত মেয়ের কাছে রাত একটার সময় বাড়ির পেছনের বাগানে, মানে ঐ যে আপনার খিড়কীর দরজাটা যেখানে রয়েছে—সেখানে আসাটা কি ঠিক হবে ? আপনি কি বলেন ? তার ওপর বলছেন, মেয়েটা ঠিক সুবিধের নয়।

কথাগুলো নীল বলে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু ওর স্থির দৃষ্টি আটকে ছিল সুতনুবাবুর মুখের ওপর। সুতনু সহসা কোন উত্তর দিতে পারছিল না। তারপর একসময় বলল—আমার ত মনে হয় না, এতটা রিস্ক নিয়ে এভাবে একটি নিম্ন রুচির মেয়ের সঙ্গে দেখা করা আপনার পক্ষে শোভন হবে। বরং আপনি কাল সকালের দিকে এসে ওকে আলাদা ডেকে প্রশ্ন করুন, তাতে অন্ততঃ আপনার ওপর কোন কলঙ্ক-টলঙ্ক পড়বে না।

মাথা নেড়ে নীল বলল—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। বরং ফোনে ওকে জানিয়ে দিই যে আমি কাল সকালে আসছি। আচ্ছা, আজও ত বলে যাওয়া যায়।

—হ্যাঁ, তা যায়। কিন্তু আজ কি আর ওকে পাবেন ?

—কেন, বাড়ি নেই ?

—সকাল থেকে ত দেখছি না। আজকাল কোথায় যে কখন হুট-হাট বেরিয়ে যায়। পাপড়ি মারা যাবার পর বাড়ির সবকিছু কেমন

এলোমেলো হয়ে গেছে। বাবাও কেমন হয়ে গেছেন। কোনদিকে নজর দেন না। আর আমিও কোনদিন বাড়ির কিছু দেখতে পারি না। পাপড়ি ছিল, ওই সব দেখাশুনা করত।

—কেন, আপনার স্ত্রী ত আছেন ?

ইদানীং শর্মিও বড্ড ভেঙে পড়েছে। আফটার অল পাপড়ি ওর ইনটিমেট ফ্রেণ্ড ছিল ত। ঠিক আছে, এক কাজ করুন। আমি বরং মালতিকে বলে দোব কাল সকালে আপনি আসবেন। ও যেন সেই সময় দেখা করে।

—ওঃ, তাহলে ত খুবই ভাল হয়। কিন্তু দেখবেন কথাটা যেন আর কেউ জানতে না পারে। ইভ্‌ন ইওর ওয়াইফ। তাহলে কিন্তু মালতির মুখ আর খোলানো যাবে না। এই ক'দিন অনেক চেষ্টা করে তবে ওকে মোটামুটি রাজী করিয়েছি।

—আপনার সঙ্গে এর মধ্যে মালতির দেখা হয়েছিল নাকি ?

—হয়েছিল। প্রায়ই ত আমি ওকে একলা ঘরে ক্রস করতাম।

— ও, আচ্ছা।

বাস স্ট্যাণ্ড এসে গিয়েছিল। দূরে একটা বাস আসতে দেখে সুতনুবাবু বলে উঠলেন—আমার বাস এসে গেছে। তাহলে কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

—ঠিক আছে। মালতিকে বলতে ভুলবেন না কিন্তু। না হলে বেচারীকে এই শীতের মধ্যে রাত একটার সময়ে ঝোপে-ঝাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

—না না, এসব ব্যাপারে আমার ভুল হয় না। খুনী তাহলে খুব শীঘ্রই ধরা পড়ছে বলছেন ?

ঘাড় নিচু করে হাত কচলাতে কচলাতে নীল বলল—আশা ত করি।

—উইস ইউ বেস্ট অব লাক। চলি।

সুতনু বাসে উঠে পড়তেই নীল বলে উঠল—তাড়াতাড়ি চল।

আরেকজনের বেরুবার সময় হল।

প্রশ্ন করা বারণ। অবাক হওয়া বারণ। এমন কি বিস্ময় প্রকাশ করাও চলবে না। বোবার মত ওর সঙ্গে চললাম।

কিন্তু মনে আমার অসংখ্য প্রশ্ন। নীল কি করতে চাইছে? এ কি সামান্য বোড়ের দান, না কিস্তি মাতের চাল? তবে কি সুতনুই খুনী? লোকলজ্জা এবং কলঙ্কের ভয়ে নীল একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে কি করবে না, তার জন্যে সে সুতনুর পরামর্শ নিতে এসেছে—এও আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে শুনে যেতে হল। বাঃ, কি গোয়েন্দার শাগরেদী করছি আমি। ঠিক আছে, যখন কথা দিয়েছি প্রশ্ন তুলব না। দেখি ওর খেলার ধরনটা।

আবার সেই গলির মোড়। সেই অপেক্ষা। সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হলেন অতনু লাহিড়ী। মাত্র এই ক'দিনেই চেহারাটা একটু তুমড়েছে বলে মনে হল। একটা শিথিল শ্লথ ভঙ্গি। বোধহয় ভাইঝির মৃত্যুতে একটু বিমর্ষ। একটু অন্যমনস্ক। কিন্তু ডাক্তারের কাছে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, তা যদি সত্য হয় তাহলে ত ভাবার কথা। নীলও নাকি জানে, ভদ্রলোক মরফিনে অ্যাডিক্‌টেড। কিন্তু দেখলে তেমন কিছু মনে হয় না। রঙটা দাদার মত না। একটু মাজা মাজা। কিন্তু আজ যেন একটা কালচে ছোপ পড়েছে বলে মনে হল। অবশ্য এটা আমার সাইকোলজিক্যাল ইলিউশান হতে পারে। যেহেতু ওনার সম্বন্ধে ঐ সব কথা শুনেছিলাম, তাই হয়ত আজ মনে হচ্ছে মরফিনের অ্যাকশানে রঙটায় কালচে ছোপ ধরেছে। সেটা নাও হতে পারে। এত বড় ফ্যামিলির লোক হয়েও চেহারাটায় একটা বিষণ্ণতার ছায়া লুকিয়ে আছে। যেটা আমার প্রথম দিনই মনে হয়েছিল। বংশগত একটা আভিজাত্য থাকা সত্ত্বেও দুঃখী দুঃখী ভাবটা রয়ে গেছে। সেটার কারণটাও মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। পারিবারিক জীবনে ভদ্রলোক সত্যিই হেল্পলেস। মানুষ সারাদিন অন্নের জন্যে বাইরে বাইরে ঘুরে এসে বাড়িতে অন্ততঃ

একটু সুখ আশা করে। এটুকু যে পায় সে বাইরের জগতের অনেক অপমান বা অবমাননা সহ্য করতে পারে। আর যে সেটুকুও পায় না, সে সত্যিই দুঃখী। সেদিক দিয়ে অতনুবাবু ত রীতিমত অসুখী। ওনাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। একমাত্র পাপড়ি যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিনই ওঁকে খানিকটা উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম। সেটা খুবই স্বাভাবিক। ভাইয়ের মেয়ে হলেও সে ত মেয়েরই মত। ছোট থেকে তাকে বড় হতে দেখেছেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে নিশ্চয়ই মনে লাগবে। সেখানে উত্তেজিত হওয়া মোটেই বেমানান কিছু না। তারপর মাত্র একদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক আর করুণ মনে হয়েছিল ওনাকে। আমার মনের কোথায় যেন একটা নরম স্থান উনি দখল করে বসে আছেন।

জামাকাপড়ের খুব একটা বাবুয়ানি নেই। সাধারণভাবে মাল-কোঁচা দিয়ে একটা ধুতি পরেছেন। পায়ে একটা বাটা কোম্পানির সাধারণ চটি। ফুল হাতা শার্টের ওপর কালো জহর কোট পরেছেন। ঠাণ্ডাটা বড় বেশী। তাই গলায় একটা মাফলার জড়িয়েছেন। মাফলারটা অবশ্য বেশ দামী কিন্তু পুরনো। হাতে একটা বড় মাপের পোর্টফোলিও ব্যাগ।

কাছাকাছি আসতেই নীল এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালো। অন্যমনস্কের মত মাথা নিচু করে আসছিলেন। আমাদেরকে হঠাৎ ঐ ভাবে সামনে এসে দাঁড়াতেই একটু চমকে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। চকিতে একটা অজানিত ভয় মুখের ওপর দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—আরে গোয়েন্দাসাহেব যে; কি খবর?

নীলও ততোধিক বিনয় প্রকাশ করে বলল—বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ ভাই, একটু বেরুতে হচ্ছে। ধান্দায়।

—আজ কোন্ দিকে?

—কলকাতার বাইরে। বর্ধমান। কিছু একস্ট্রা অর্ডার এসেছিল।

সাপ্লাইটা আজই করতে হবে।

—আপনার বিজনেসটা যেন কিসের?

—নানা রকমের। কোন ঠিক নেই। তবে মোটামুটি অর্ডার সাপ্লাইটাই মেন।

মুখে একটা চুকচুক শব্দ করে নীল বলল—তাহলে ত আপনাকে আটকানো যাচ্ছে না। অথচ আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম।

—বেশ ত, বলুন না, দু' পাঁচ মিনিট দেরিতে কি এসে যায়। বলে উনি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। চার-মিনার। আমার দিকে এগিয়ে দিতে যথারীতি না বললাম।

নীল একটা তুলে নিয়ে বলল—চা খাবেন নাকি?

—নাঃ, এইমাত্র ত খেয়ে এলাম। তা কি বলবেন বলুন?

—ব্যাপারটা বুঝলেন অতনুবাবু, বেশ গোপনীয়। আমি চাই না আর কেউ এসব জানুক।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমায় যা বলবেন আর কেউ তা জানবে না।

—আপনার বাড়ির ঐ ঝিটা, কি যেন নাম?

—মালতি।

—হ্যাঁ, মালতি। মেয়েটা বোধ হয় খুব একটা ভাল নয়। তাই না?

—জঘন্য, জঘন্য, একেবারে নষ্ট মেয়েছেলে?

—তাই নাকি? নীল যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—খবরদার, ওর পাল্লায় পড়বেন না, একেবারে উচ্ছন্নে যাবেন। মোস্ট্ ঢলানি মেয়ে।

—আমারও সেই রকম মনে হয়েছিল। আরো কি জানেন, মেয়েটার লাগানী-ভাঙ্গানীর একটা স্বভাব আছে।

—থাকবেই। ঝি ক্লাসের মেয়ে, ওদের আবার ভদ্রতা অভদ্রতা।

—ভাবিয়ে তুললেন ত মশাই।

—কেন, কেন ? কি হয়েছে বলুন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—আজ রাত একটায় ও আমাকে গোপনে দেখা করতে বলেছে।

—কি আস্পর্ধা ! ভদ্রলোক যেন বোমা ফাটার মত ফেটে পড়লেন —আপনাকে গোপনে দেখা করতে বলেছে ? কেন ?

—ইদানীং আপনাদের সঙ্গে কি ওর কোন রকম বচসা-টচসার ব্যাপার ঘটেছে ?

—ঝিয়ের সঙ্গে আবার বচসা করব কি ? বলতে পারেন ধমক-ধামক। তা যে রকম ঢলানি মেয়ে, ধমক ত খাবেই।

—আপনার সঙ্গে কিছু হয় নি ?

—নাঃ। ও ত আর আমাদের ঝি নয়।

—বড় গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা।

—কেন, কেন ? আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে নাকি ?

—ঠিক সে রকম খোলাখুলি কিছু বলেনি। তবে আজ রাত একটার সময় এই বাড়ির পিছনে যে বাগানটা আছে সেখানে সে আসতে বলেছে। এ বাড়ির ভেতরের অনেক গোপন খবর নাকি ও দিতে চায়। ওর ধারণা হয়েছে, সেই সব খবর জানতে পারলেই আমার পক্ষে পাপড়ির হত্যা রহস্য সমাধান করা সহজ হবে।

—এতদূর আস্পর্ধা মাগীর! বলেই থেমে গেলেন। বুঝতে পারলেন, বলাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি। সুর পাল্টে বললেন—ব্যানার্জী, গোয়েন্দাগিরিই করুন আর যাই করুন ঢলানি মেয়েদের কাছে আপনারা শিশু। ওরা আপনাদের এক হাটে কিনবে, অন্য হাটে বেচবে। ওই সব গুল-তাপ্পি মেরে আপনাকে ফাঁসাতে চাইছে। দেখেছে আপনাকে অল্পবয়েসী লালটু মার্কা ছেলে, পয়সা-কড়িও আছে, টোপটা ফেলে দিয়েছে। খবরদার ও রাস্তায় পা দেবেন না। মেয়ে ভালো নয়। একেবারে শয়তানীর আড়কাঠি।

—তা হলে বলছেন দেখা করা উচিত হবে না?

—আলবৎ নয়। দেখা করুন। অন্য সময়ে।

—কিন্তু এত বড় একটা সুযোগ কি হাতছাড়া করা ঠিক হবে?

—আরে মশাই, ও ত দু'দিনের ছুকরি। ও কি জানে আমাদের ফ্যামিলির? কি বলবে ও আপনাদের?

—কে খুন করেছে তা নাকি ও জানে।

—গুষ্টির মাথা জানে। জানলে এতদিন চুপ করে বসে থাকত? দেখতেন এতদিনে কি রকম ব্ল্যাকমেল শুরু করে দিয়েছে।

খুব খাঁটি কথা শুনেছে, এইভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল —কারেক্ট, এদিকটা ত আগে ভাবি নি। ঠিকই ত, তুই যদি জানবিই, তাহলে ত ব্ল্যাকমেলই করবি। নাঃ মশাই, আপনি ভালোই বলেছেন, এভাবে রাত দুপুরে বাগানে দেখা করা উচিত না। তার ওপর সাপ-খোপও থাকতে পারে।

—না, সাপখোপ নেই। তবে বিছে আছে অনেক।

—ওরে বাবা, বিছের ব্যাপারে আমার ভীষণ অ্যালার্জী। মিঃ লাহিড়ী, দয়া করে আমার হয়ে একটা কাজ করবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন।

—আপনি আজ ফিরছেন কখন?

—এই ধরুন, রাত ন'টা সাড়ে ন'টা।

পকেট থেকে একটি চিঠি বার করে অতনুবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—আমি ভেবেই এসেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে চিঠিটা কাউকে দিয়ে মালতির হাতে পাঠিয়ে দোব। দয়া করে যদি এটা ওর হাতে দিয়ে দেন—

চিঠিটা হাতে নিয়ে বললেন—কি লেখা আছে এতে?

—ঐ আর কি। পড়ুন না।

চিঠিটা তাড়াতাড়ি করে খুলে উনি পড়লেন—আজ দেখা করা সম্ভব হল না, কাল সকালে আসব।

মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে অতনুবাবু বললেন—আমি ত আর মালতির সঙ্গে কথা বলি না। ঠিক আছে, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দোব'খন। তাহলে কাল সকালে আসছেন ?

—হ্যাঁ।

—নাঃ, দাদাকে বলে এর একটা বিহিত করতে হবে। মাগীর আস্পর্ধা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শেষকাল একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে ট্র্যাপ করার ধান্ধা ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তাহলে আমি চলি ? কেমন ?

ভদ্রলোক হন্‌হন্ করে চলে গেলেন। তবে মনে হল, যেন একটু খোঁড়াচ্ছেন। সেটা কেন, বুঝলাম না। হয়ত পায়ে চোট-টোট লাগতে পারে।

উনি চলে যেতেই নীলের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও মিটিমিটি হাসছে। প্রশ্ন করা বারণ। হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নীল বলল।—কি রাগ দেখলি ? একেই বলে ভদ্রতার আঁতে ঘা। বাড়ির ঝি। ঝিয়ের মত থাকবে। তা নয়। চাঁদে হাত দেওয়া ! মিড্‌ল্ ক্লাস ইগো। ঝাঝ দেখ। মালতি লেখাপড়া জানে না জেনেও চিঠিটা নিয়ে বেমালুম গায়েব করে দিল ! ওঃ রাগ কি সর্বনাশা !

গাড়িটা স্টার্ট করে আমহার্স্ট স্ট্রিটের রাস্তা ধরল। বুঝতেই পারলাম, এবার ও কোথায় যেতে চায়। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, একই কায়দায় দু'জনের কাছে গিয়ে বলে এল, কাল সকালে মালতির সঙ্গে দেখা করবে। একই ভনিতায় দু'জনকে বলল, মালতি আজ রাত একটায় ওকে কিছু গোপন কথা ফাঁস করে দেবে। এইসব কায়দা করে নীল যে ঠিক কি করতে চাইছে, সেটাই ভেবে উঠতে পারলাম না। ও ঘুঘু ধরার জন্যে ফাঁদ পাতছে। কিন্তু ফাঁদটা কি, তা বুঝতে পারছি না। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে থামল ডাক্তার বাসুর চেম্বারের সামনে। তখন প্রায় দশটা দশ। চেম্বারে মোটামুটি কয়েকজন রুগী ছিল। আমাদের দেখে ডাক্তার বাসু কিন্তু

আজ খুব একটা খুশি হলেন না। একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। অন্য-মনস্কের সুরে ভদ্রতা করে বসতে বললেন।

আমরা বসলাম। প্রায় মিনিট পনের পর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—একান্তই দরকার?

নীল বোধহয় ডাক্তারের ব্যবহারে একটু বিরক্ত হয়েছিল। বলল—একটু নিশ্চয় দরকার। নইলে আর আপনার সময় নষ্ট করতে আসব কেন?

খোঁচাটা ডাক্তার বুঝলেন। বললেন—আপনারা পাশের ঘরে বসুন, এঁকে ছেড়ে দিয়ে আসছি।

আরো মিনিট পাঁচেক পর উনি এলেন। পূর্বের সেই অবাঞ্ছিত উৎপাতের বিরক্তিটা ঠিক এখন নেই। কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবটা রয়ে গেছে। পাশের বেসিন থেকে হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে, সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন -হাতকড়ি নিয়েই এসেছেন তাহলে? কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কি অ্যারেস্ট করা যায়?

নীল প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল--ও দায়িত্বটা ঠিক আমার না। ওটা পুলিসের কাজ। আর আপনিও জানেন, আমি পুলিস নই। তাছাড়া আপনি নিছক ভয় পাচ্ছেন কেন? খুন যদি আপনি না করে থাকেন, তাহলে ভয়টা কোথায়?

—দিনকে রাত করতে আপনারা সবকিছুই করতে পারেন, আর এই সামান্য কাজটা করতে আপনাদের কতটুকুই বা সময় লাগবে?

ডাক্তারের মেজাজ আর শরীর ভালো নেই, তা তাঁর কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে! একটু বিরক্ত, একটু অন্যমনস্ক আর সহ্য না করতে পারার মত মনোভাব। তবু শিক্ষিত লোক। যতদূর সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখেই কথা বলছিলেন। তবে উনি চাইছিলেন যেন ওঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ না বসে থাকি। কিন্তু প্রয়োজনে নীল অত্যন্ত নাছোড়বান্দা এবং ছ্যাচড়া। দরকার হলে বাউণ্ডুলেদের সঙ্গে রাস্তার ধারে বসে বাংলা মদ খেতে পারে। তেমন তেমন প্রয়োজনে বেশ্যাকে মা বলে

পুজোও করত পারে। আজও ডাক্তারকে ও সহজে ছাড়ান দেবে বলে মনে হল না। ডাক্তারের বিরক্তিকে কোন মূল্য না দিয়ে বলল—আপনি ঠিকই ধরেছেন ডাক্তার বাবু। প্রয়োজনে আমরা রাত দিন এক করতেও পিছপা হই না। তবে সে-সব কিছু না। আপনাকে একটা খবর দিতে আসা।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে উনি বললেন—খবর, আমাকে ? কি খবর ?

এর পর নীল ঠিক যে কায়দায় আর যে ভঙ্গিমায় কিছুক্ষণ আগে অতনুবাবু আর সুতনুবাবুর কাছে মালতি প্রসঙ্গ পেড়েছিল, ঠিক সেইভাবে ডাক্তারের কাছেও ওর বক্তব্য রাখল।

সব শুনে ডাক্তার বলল—তা এসব কথা আমায় বলে কি হবে ? মালতি ভালো বুঝেছে, তাই আপনার কাছে কনফেস করবে।

—সে ত বটেই। কিন্তু আপনার কি মত ?

—আমি কি মালতির লিগ্যাল গার্জেন না আপনার পরামর্শদাতা ? বোথ অব ইউ আর অ্যাডাল্ট এনাফ। আপনারা কি করবেন, সেটা আপনাদের বোঝার ব্যাপার।

বেশ বুঝতে পারলাম, নীলের কায়দাটা ডাক্তারের ক্ষেত্রে ঠিক প্রযোজ্য হচ্ছে না। ডাক্তার নীলকে কোন রকম পাত্তাই দিচ্ছেন না। কিন্তু নীল পিছিয়ে যাবার ছেলে না। ও বলল—সে ত একশো বার। তবে আপনি ও-বাড়ির সঙ্গে পরিচিত, মালতিকে চেনেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েটার অনেক বদনাম শোনা যায়। এতে এত রাগ করার কি থাকতে পারে ?

—আমি ত রাগি নি। সে বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেছে, তাই আপনাকে ডেকেছে, আর আপনি একটা বিশেষ প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করবেন। এতে নাম আর বদনামের কি থাকতে পারে, আমি বুঝি না। তবে একান্তই যদি আমার মতামত শোনার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলে আজ রাত্রে দেখা না করে, সকালেই করতে

পারেন। আপনার পক্ষে ত তার সঙ্গে দেখা করার কোন অসুবিধা নেই। ইচ্ছে করলেই যখন খুশী দেখা করতে পারেন।

নীল যেন সব কথা বুঝতে পেরেছে এমনিভাবে ঘাড় নাড়ল—ঠিক আছে, সেই ভাল, তাহলে আজ আমরা উঠি।

আমরা উঠে পড়লাম। হঠাৎ ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—রাত ক'টায় দেখা করতে বলেছে?

চকিতে নীল ঘুরে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ডাক্তারকে দেখে নিয়ে বলল—রাত একটায়।

—অত গভীর রাতে? বাবা, সাহস আছে। তা মিস্টার ব্যানার্জী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—হ্যাঁ, করুন।

—শুধু কি এই কথাটা আমাকে জানাতে এসেছিলেন, না আসার অন্য উদ্দেশ্য ছিল?

নীল হাসতে হাসতে বলল—ডাক্তার, আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান। আমি শুধু এই মামুলী কথাটা জানাবার জন্যেই আসি নি। আপনাকে জানাতে এসেছিলাম, পুলিসের বিনা অনুমতিতে এ শহর ছেড়ে আপনি কোথাও যাবেন না।

ডাক্তারও হাসতে হাসতে বললেন—ইয়েস, তাই বলুন। তারপর একটা 'কমার' মত বিরতি দিয়ে বললেন—নাঃ, আপাততঃ কোথাও যাচ্ছি না। আর উপযুক্ত প্রমাণ না নিয়ে আশা করি এর পর থেকে আমাকে বিরক্ত করতে আসবেন না।

—মনে থাকবে। বলেই আর আমরা দাঁড়ালাম না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বারণ থাকা সত্ত্বেও বলে ফেললাম—খুব খচেছে।

—হ্যাঁ, খুব। আর তাই ত আমার লাভ। বেশি না রাগলে কি আর ওঠার মুখে জিজ্ঞাসা করত, কত রাত্রে মালতি আমাকে দেখা করতে বলেছে? তাড়াতাড়ি চল্। লোকটা যা দেরি করিয়ে দিল।

আবার না মালতি মিস্ হয়ে যায়।

আর আমি চুপ থাকতে পারছিলাম না। আমার যেন প্রশ্নের ধাক্কায় দম আটকে আসছিল। বারণ থাকা সত্ত্বেও নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম—কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

—উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছে।

—সে তো বরাবরই। মালতি কি সত্যিই তোকে ডেকেছে?

—না। বরং উলটোটা। আমিই ওকে রাত একটায় যেতে বলেছিলাম।

—কি করতে চাইছিস বল্ ত?

—এখন এর বেশি কিছু বলা যাবে না।

—তুই এত মালতিকে নিয়ে পড়লি কেন?

—উপস্থিত বুদ্ধি অ্যাপ্লাই কর।

—তার মানে, মালতিই খুনী?

—সব বলব, শেষ দৃশ্যে। কেন না অদ্যই নাটকের শেষ রজনী। আর একটু ধৈর্য ধর।

ওরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এখন আর কিছুই বলবে না। গাড়ি আবার শ্রীধর বাইলেনে এসে থামল। বলতেই হল—আবার এখানে এলি?

—ভাল করে চার না ছড়ালে মাছ আসবে কেন বল। এত সব দামী দামী মাছ।

—এবার কার সঙ্গে?

—আমার শ্রীরাধিকার সঙ্গে। ঐ দেখ লণ্ড্রীতে দাড়িয়ে আছে। কাল বলেছিল, ঠিক এগারোটায় জামা-কাপড় নিতে আসবে লণ্ড্রীতে। এখন এগারোটা দশ। কি রকম প্রাণের টান দেখছিস? এখনও অপেক্ষা করছে। বোস, আসছি।

ও চলে গেল। দেখা করল। দু' মিনিটের মধ্যে কথাবার্তা শেষ করে ফিরে এল। ও বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম না। করে লাভ নেই

বলে। কেবল বললাম—এবার কোথায়?

—তোর সিম্পল লায়নের কাছে।

খুব দ্রুত আমরা থানায় পৌঁছে গেলাম। এবং আমাদের ভাগ্য ভাল, সিংহীমশাই তখন নিজের খাঁচাতেই ছিলেন।

থানায় ঢোকার মুখে নীল বলেছিল—আজ রাগাবি না। রাগলে সিম্পল লায়নের যেটুকু বুদ্ধি আছে সেটাও লোপ পেয়ে যাবে। কাজের কাজ কিছু হবে না?

নীলই প্রথমে ঢুকল। ওকে দেখে বেশ খুশীর ছোঁয়া লাগল সিংহীমশাইএর মুখে। কিন্তু চোরের মন বোঁচকার দিকে থাকেই। সঙ্গে সঙ্গে নীলের পেছনে ওর দৃষ্টি চলে এল। এবং আমাকে দেখে যথারীতি পেঁচার মত মুখ করে নীলকে বসতে বললেন।

—তারপর নীল, কতদূর এগুলে বল?

—পাপড়ির হত্যাকারীকে ধরতে চান?

—হেঃ, কি যে বল। এই কেসটার ব্যাপারে আমি বড় ওরিড জান?

মনে মনে ভাবলাম, একজন খেটে মরছে। আর একজন চেয়ারে বসে ওপরের চেয়ারের স্বপ্ন দেখছে।

—তাহলে আজ রাত্রেই ব্যাপারটা সেরে ফেলা যাক।

—মানে, মানে?

মানে মানে করতে করতে উনি চেয়ারে সাঁটা কোমরটা কোন রকমে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। হাত নেড়ে নীল ওকে বসতে বলল—এক্ষুণি ওঠাউঠির কোন প্রয়োজন নেই। তার আগে দরকারী কথাগুলো শুনে নিন। বেশ কয়েকজন আরম্ড্ কনস্টেবল নিয়ে রাত ঠিক সাড়ে বারোটায় লাহিড়ীবাড়ির পেছনের বাগানের খিড়কি ঠেলে, বাগানের অনেক ঝোপঝাড় আছে সেখানে অপেক্ষা করবেন। কোন রকম জানাজানি না হয়। পারলে সবাইকে প্লেন ড্রেসেই নিয়ে যাবেন।

—কিন্তু খিড়কির দরজা ত বন্ধ থাকে।

—সে ব্যবস্থা করা আছে। রাত দশটার পর খিড়কির দরজা খোলা থাকবে। ছবি তুলতে পারেন?

—ঐ একটা জিনিস মাইরি ঠিক ম্যানেজ করে উঠতে পারলুম না। ছবি তুলতে গেলেই আমার হাত কেঁপে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, কোন্ জিনিসটা যে তোমার হাত না কেঁপে হয়ে যায় মাইরি, সেটাই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু নীলের বারণ। আজ ওনাকে ক্ষেপানো চলবে না। তাই চুপ করেই গেলাম।

—ঠিক আছে, নীল বললে—ছবি-টবি তুলতে হবে না। আপনি আপনার প্রয়োজন মত অ্যাকশান নেবেন। তবে কোন রকমেই যেন আসামী পালাতে না পারে। আর পালানো মানেই আপনার ক্যারিয়ার ডুমড্।

—আরে রাম রাম। আসামী আমার হাত থেকে পালাবে? সে গুড়ে মুড়ি। ওসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। পুরো ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। কিন্তু আসামীটা কে?

—এখন না জানলেও চলবে। ওখানে গেলেই বুঝবেন।

—তুমি কখন যাবে?

—ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আমি থাকব। তবে একটা কথা বলে যাই, দয়া করে অযথা গুলি-ফুলি চালিয়ে একটা প্যানিক ক্রিয়েট করবেন না।

—পাগল হয়েছো? পাকা ঘুঁটি কেউ নষ্ট করে?

—স্পটেই বোঝা যাবে। এখন চলি।

—একটু চা খেয়ে যাবে না?

—না। সকাল থেকে পেটে তেমন কিছু পড়ে নি। আর লিভার খারাপ করতে রাজী নই।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলাম। গাড়ি ছুটে চলল সোজা দক্ষিণে।

নামতে নামতে শুনলাম, নীল বলছে—ঠিক রাত এগারোটায় আসব। একদম রেডি হয়ে থাকবি, বলেই হুস করে বেরিয়ে গেল।

কথায় বলে, মাঘের শীত বাঘের গায়ে। হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছি। তাও দেশ পাড়াগাঁ না। খাস কলকাতা শহর। উত্তর কলকাতার জনবহুল বসতি। কোন বারেই শীতটা এ রকম গা কেটে বসে না। অন্ততঃ আমি কোনদিনও কলকাতা শহরে এ রকম হাড়-কাঁপানো শীত পাই নি। কিন্তু এ বছরে শীতটা সত্যিই জম্পেস হয়ে পড়েছে। নীল বলেছিল, তৈরী হয়ে আসিস। একে শীতকাতুরে। ও না বললেও বেশ কয়েকটা গরমের জামা গায়ে চাপাতাম। চাপিয়েছিও। হাতকাটা দুটো সোয়েটার। তার ওপর মোটা পুলওভার। এ বছরই এসপ্ল্যানেড থেকে কিনেছি। ভুটিয়া মেড। তাতেও যেন শীত যায় না। লাহিড়ীবাড়ির পেছনে ডুমুর গাছটার নিচে আমাকে বসিয়ে দিয়ে নীল কোথায় যেন হাওয়া।

বসে আছি তো আছিই। সময় যেন আর কাটতে চায় না। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। তার ওপর মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া এসে হি-হি করা ভাবটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা সিগারেট খেতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু সিগারেট খাওয়া বারণ। আসামী নাকি বুঝতে পারবে আমাদের অবস্থান।

মাথায় একটা মঙ্কি ক্যাপ পরেছিলাম। তার কারণ আছে। ক'দিন আগেই ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছি। মঙ্কি ক্যাপটার গায়ে হাত বুলোতেই টের পেলাম শিশিরে ভিজে গেছে। কে জানে, আর কতক্ষণ এ ভাবে কাটবে?

মাটিতে উবু হয়ে বসে আছি ইটের ওপর। এমনি কোন ভূতটূতের ভয় আমার নেই। কিন্তু সকালেই অতনুবাবু বলেছিলেন, বাগানে সাপ-খোপ নেই। কিন্তু বিছে আছে। যদিও হাতে একটা

চার সেলের টর্চ রয়েছে, তবু টর্চ এখন জ্বালানো চলবে না। নীলের দিক থেকে টর্চের সংকেত না পেলে আমাকে টর্চ নিভিয়েই বসে থাকতে হবে। বিছের কামড় খেলেও না।

খেয়াল নেই কতক্ষণ কেটেছে। অন্ধকারটাও এত গভীর যে, হাতঘড়ির রেডিয়ামেও সময় নির্দেশ পাচ্ছি না। দূরে কোথাও দুটো কুকুর থেকে থেকে পরিত্রাহি ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শিয়ালদহর দিক থেকে ট্রেনের শব্দ ভেসে আসছে। একটাও জোনাকী নেই। ঝিঁঝিঁর একটানা আওয়াজও নেই। মনে হচ্ছে, সবাই যেন একসঙ্গে শীতের আমেজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অথচ আমি জানি, আজ এই নিশুতি রাতে কয়েকটা প্রাণীর চোখে ঘুম নেই। চারজন কনস্টেবল। আমি, নীল আর মোটা সিংহী। আর কেউ কি জেগে আছে? নাকি নীলের সব অনুমানই মিথ্যে? চার ফেলা পুকুরে মাছ কি আসবে না? বৃথাই যাবে এই জাল ফেলা? তাহলে ত সিংহীমশাই-এর কাছে মুখই দেখানো যাবে না। কে জানে, আরো কতক্ষণ এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে।

বসে বসে পায়ে ঝিঁঝিঁ লাগা সত্ত্বেও একটা ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কে যেন কানের পাশ থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল—বি রেডি অজু। বললেই আলো জ্বালাবি।

যত ফিসফিসে আওয়াজই হোক, এ কণ্ঠস্বর নীলের। তার মানে, নীল আমার পাশেই ছিল। চোখ রগড়ে অন্ধকারে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। এমন সময় লাহিড়ী-বাড়ির পিছনের দরজায় অতি সন্তর্পণে একটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ। মনে হল, একটা দরজা যেন একটু খুলল। পরক্ষণেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল ঐ রকম ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ করে।

যতদূর সম্ভব চোখ আর কান সজাগ রেখে অন্ধকারে আমাদের বিশেষ অতিথির অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। হঠাৎ, স্পষ্টই মনে হলো, এক নারীমূর্তি ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো ঐ বাগানের টগর গাছের নিচে।

গাছটার নিচে আরো বেশী অন্ধকার। অন্ধকার সর্বত্রই। তবে কিছু-ক্ষণ অন্ধকারে থাকলে সেটা ক্রমশঃ চোখে সয়ে আসে। তখন অন্ধ-কারের নিজস্ব আলোয় অনেক কিছু চোখে ধরা পড়ে।

এই রাত্রে, এই পরিবেশে একটি মেয়ে! তবে কি ও মালতি? নীলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? কিন্তু নীল আসবে না—এ রকম একটা চিঠিও ত পাঠিয়েছে।

তাহলে?

নারীমূর্তির চলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি না, এ মালতি, না অন্য কেউ? খুব সম্ভবতঃ ও কোনো ধূসর অথবা কালো রঙের শাড়ি-টাড়ি পরেছে। বোধহয় গায়ে একটা কালো রঙের র‍্যাপারও আছে। আসলে রঙ-টঙ চেনার ত কোন উপায় নেই।

আবার সব কিছু পূর্বের মত অন্ধকারে ডুবে গেল। কোন শব্দ নেই। কোন মূর্তির অস্পষ্ট আনাগোনাও না। টগর গাছের নিচে গভীর অন্ধকারে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে যে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে তা বোঝারও উপায় নেই।

আমি বুঝতে পারছি না এর পরে ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেবে? কি ঘটতে চলেছে তাও আমার বোঝার বাইরে। আসলে নীল যে কি করতে চাইছে তাও আমার জ্ঞানে আসছে না।

সকালে তিনজনের কাছে গিয়েই মালতির আসার সংবাদ জানিয়ে এল। আবার তিনজনকেই বলে এল, আজ রাত্রে ও মালতির সঙ্গে দেখা না করে কাল সকালে দেখা করবে। এদিকে নিজে এসে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারো প্রতীক্ষায়। কার প্রতীক্ষায়? নিশ্চয় খুনীর। কিন্তু খুনী এখন এখানে আসবেই বা কেন? এদিকে এ মেয়েটা কে? মালতি? কিন্তু অতনুবাবু আর সুতনুবাবুর মারফত নীল জানিয়ে দিয়েছে, ও আজ রাত্রে আসছে না। তাহলে এই অস্পষ্ট নারীমূর্তি কোত্থেকে এল? মালতি ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডে আর কোন মেয়ে জড়িত আছে নাকি? শর্মিষ্ঠা না মালবিকাদেবী? নাকি মঞ্চের

অন্তরালে থাকা দেবতনুর উন্মাদ স্ত্রী? কি যে ছাই হতে চলেছে ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা কিছু একটা ঘটবার পূর্বলক্ষণ। ঝড়ের আগে যে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে, ঠিক সেই রকম।

হঠাৎ চিন্তায় যখন অন্যমনস্ক, ঠিক তখনি প্রায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক পুরুষ মূর্তি। কোথা থেকে এল, কেমন করে এল কিছুই বুঝতে পারি নি। অল্পক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মূর্তিটা একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরে ক্রমশঃ আমি যে গাছটার নিচে বসে আছি সেদিকেই আসতে শুরু করল। বোধহয় কোন কিছুতে আঘাত পেয়ে ছায়ামূর্তি হোঁচট খেল। উঠে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে মুখ করে হাতের টর্চটা একবার জ্বালিয়েই উলটো দিকে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। ঐ দিকেই সেই টগর গাছটা। অর্থাৎ মেয়েটি ওখানে আছে।

কি করব না করব বুঝতে পারছি না। কোন নির্দেশও পাই নি। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে যখন প্রায় টগর গাছটার কাছাকাছি গেছে, সেই মুহূর্তেই অন্ধকার থেকে নারীমূর্তি এগিয়ে এসে পুরুষটির সামনে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক লহমা। তারপর ঠিক কি যে ঘটে গেল কিছুই বোধগম্য হল না।

নারীকণ্ঠের প্রচণ্ড আর্তনাদ—ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে। পরক্ষণেই ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বলে উঠল। নীলের চিৎকার শুনতে পেলাম—অজু, আলো জ্বালা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চার সেলের টর্চ অন্ধকার ছিঁড়ে আলোর রোশনাই ছুঁড়ে দিল। উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, পূর্বের ছায়ামূর্তি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে স্পাইরালটার দিকে পালাচ্ছে। নীলের ব্যস্ত-সমস্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল—মিঃ সিন্‌হা, ওকে পালাতে দেবেন না। ও স্পাইরালটার দিকে গেছে। অজু, আলো দিয়ে ওকে ফলো কর।

নীলের চিৎকার শুনেই বিশালবপু সিংহীমশাই উদ্যত রিভলবার

হাতে কোত্থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাতে আরম্ভ করলেন—হল্ট, হল্ট।

ছায়ামূর্তি ততক্ষণে স্পাইরাল বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। পরক্ষণেই এই প্রচণ্ড শীতের ঘুমন্ত রাত্রের নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সিংহীমশাই-এর রিভলবার আওয়াজ তুলল—গুড়ুম, গুড়ুম।

ধপ করে একটা শব্দ করে ছায়ামূর্তি সেখানেই পড়ে গেল। আর গাছে গাছে ভেসে উঠল ঘুমন্ত পাখিগুলোর রাতজাগা কোলাহল।

নীলের চিৎকার, সিম্পল লায়নের রিভলবার আর পাখিদের কোলাহল, এই সব মিলিয়ে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন উঠে পড়েছে। লাহিড়ীবাড়ির ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলোর রেখা।

আর কোথায় কোথায় কি হচ্ছে, এসব কিছু না দেখে আমি প্রথমেই ছুটে গেলাম টগর গাছের নিচে, যেখানে নীল এখনও বসে আছে। টর্চের আলো জ্বালিয়ে দেখি, মালতির রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। যন্ত্রণায় সে মাঝে মাঝে কুঁকড়ে উঠছে। আর তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে নীল। মালতির পেটে একটা গভীর ক্ষত। অজস্র রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে।

নীলকে তখন বলতে শুনলাম—চিনতে পেরেছ মালতি, কে তোমাকে মেরেছে? অতি কষ্টে মালতি উত্তর দিল—হ্যাঁ, মেজোবাবু।

চমকে উঠলাম। মেজোবাবু? মানে অতনু লাহিড়ী? নীলের মুখের দিকে তাকালাম। ও বলল—পরে সব শুনিস। এক্ষুণি গিয়ে সুতনুবাবুকে বল অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে।

*    *    *

মালতি বাঁচল না। বাঁচলেন না অতনু লাহিড়ী। সিংহীমশাই-এর ছুটো গুলিই তাঁর দেহে লাগে। গুলিতে তাঁর এত বাঘমারা টিপ আগে জানতাম না। নাঃ, লোকটার এই গুণটা অস্বীকার করা যায় না। একটা লেগেছিল উরুতে আর একটা পাঁজরার ঠিক নিচেই। মালতি মারা গিয়েছিল ভোর রাত্রে। অ্যাব্‌ডোমেন পুরো ওপ্‌ন্‌ হয়ে

গিয়েছিল। তবে অধিক রক্তপাতই হয়ত মৃত্যুর কারণ। একমাত্র অতনু লাহিড়ীর নামটুকু ছাড়া সে আর কিছুই বলে যেতে পারে নি।

সেই দিনই বেলা দুটো নাগাত মারা গেলেন অতনু লাহিড়ী। তবে মৃত্যুর আগে নিজের স্টেটমেণ্ট দিয়ে গিয়েছিলেন। নীল সেটা টেপ করে নেয়।

রবিবার বিকেলে এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেছিল নীল। বাইরের লোক বলতে একমাত্র ডাঃ অরিন্দম বাসু আর সিংহীমশাই। আমি আর সত্যেনদা ত ঘরের লোক।

সিংহীমশাই এসেই হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। প্রথমেই ঐ বিশাল শরীর নিয়ে আচমকা নীলকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা ঠাস্ করে চুমু খেয়ে বললেন, তুমি মাইরি একটা চীজ। তোমার মা মাইরি যাকে বলে একেবারে রত্নগভ্ভা। উঃ, কি বুদ্ধি মাইরি তোমার। আমি হলে ত শালা জীবনেও এ কেস ক্লীয়ার করতে পারতুম না।

এখন আর আমার পিছনে লাগতে বাধা নেই। তাই সত্যেনদাকে বললাম—আচ্ছা সত্যেনদা, এই কেসের পর একটা প্রমোশন আশা করা যায়! কি বলেন?

—তোমার তাতে কোন্ পাকা ধানে মই লাগছে শুনি? আর প্রমোশন হবে না কেন? আলবৎ হবে। যার এমন সোনার টুকরো ভাই রয়েছে তার প্রমোশন হবে না ত কি তোমার হবে?

সত্যেনদার দিকে চেয়ে বললাম—বটেই ত, বটেই ত!

কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে সিংহীমশাই বললেন—ডেঁপো ছোকরাদের আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না। তা নীল এবার ভাল করে বুঝিয়ে বল ত, কী থেকে কী করলে। এখনও ত আমার মাথায় মাইরি কিছুই ঢুকছে না।

সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার অরিন্দম বাসুও বললেন—নীলাঞ্জনবাবু, আপনার মুখ থেকে সব কথা শুনব বলে আমার অনেক কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসেছি। কাইণ্ডলি আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবেন না।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নীল মৃদু হেসে বলল—আমি জানি আপনা-দের অনেক প্রশ্ন। সব আপনাদের খুলে বলব বলেই ত ডেকে পাঠিয়েছি। তার আগে আজ দুপুরে আমি নিজে হাতে একটা জিনিস রান্না করেছি। খুব একটা খারাপ লাগবে না। খেতে খেতেই শোনা যাক।

সিংহীমশাই ত আগেই লাফিয়ে উঠলেন—এ তো ভয়ংকর উত্তম প্রস্তাব।

আমার কিন্তু একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—এখানেও ভয়ংকরটা চলে না।

চোখ কটমটিয়ে সিংহীমশাই তাকিয়ে ছিলেন, ম্যানেজ করলেন সত্যেনদা—আরে নীল, দীনুকে ওগুলো নিয়ে আসতে বল। ঠাণ্ডা হলে ভালো লাগবে না।

—আমি যেন এসে গেছি—বলেই দীনু দু' প্লেট ভর্তি প্রণ পকৌড়া আর চিলি-চিকেন নিয়ে ঢুকল। তখনও খাবারগুলো থেকে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সিংহীমশাই-এর দিকে তাকিয়ে দেখি ওনার রাগ-টাগ সব কোথায় উবে গেছে। তড়াক করে একটা পকৌড়া নিয়ে মুখে ফেলেই বললেন—যদিও খাওয়ানোটা আমারই উচিত ছিল—তবু নীল ইজ নীল। ওর তুলনাই হয় না।

খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগল। নীল বলতে শুরু করল—আমি বলে যাব, না আপনারা এক এক করে প্রশ্ন করবেন ?

ডাক্তার অরিন্দম বাসু বললেন—এমন ডিলিসিয়াস রান্না যে করতে পারে তার গল্প পরিবেশনটাও নিঃসন্দেহে হবে সুইট-টু-হিয়ার। আপনি বলুন—আমরা শুনব।

—বেশ, আমিই বলছি। তার আগে এই টেপটা শুনুন।

একটা গরম চিলি-চিকেনের ঠ্যাং মুখের মধ্যে পুরে 'আঃ' 'উঃ' করতে করতে সিংহীমশাই জড়িয়ে জড়িয়ে একটা খিচুড়ি ল্যাংগোয়েজ

উচ্চারণ করলেন, যেটা শোনালো এইরকম—'আগেই—শ্-শ্—নেছি।'

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। সিংহীমশাই-এর ল্যাংগোয়েজটা ঠিক কোন্ দেশের ধরতে পারলাম না।

ব্যাখ্যা করে দিল নীল—উনি বলতে চাইছেন উনি 'আগেই শুনেছেন।' কিন্তু এদেরকে শোনানো দরকার, বলেই ও টেপের নবটা টিপল। যন্ত্র মাধ্যমে প্রথমে নীলের গলার আওয়াজ ভেসে এল—অতনুবাবু, আমি নীল ব্যানার্জী বলছি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? এর পর খানিকটা হিস্ হিস্ শব্দ। তারপর খুব ধীরে এবং অতি কষ্টে উচ্চারিত একটি শব্দ, 'হ্যাঁ'। আবার নীলের স্বর, আপনার কি কিছু বলার আছে? খানিকটা হিস্‌হিস্ শব্দ। তারপর প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট ধরে যন্ত্রটা মাত্র কয়েকটা কথা বলল থেমে থেমে, অতি কষ্টে, তার সম্পূর্ণ বয়ানটা হল—আমি আমার ভাইঝি পাপড়িকে খুন করেছি। কারণ সে যা করতে চাইছিল তা আমার কাম্য নয়। তাই—। এ ব্যাপারে আর কেউ দোষী নয়। মালতিকেও আমি খুন করেছি। কেননা, মেয়েটা বদ।

টেপটা বন্ধ করে দিল নীল। তারপর বলতে শুরু করল—মৃত্যুকালীন জবানবন্দী থেকে জানা যাচ্ছে যে অতনুবাবুই তাঁর একমাত্র ভাইঝি পাপড়িদেবীকে সজ্ঞানে এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে খুন করেছেন। অর্থাৎ খুনী ধরা পড়ল। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির এই ধরনের স্টেটমেন্টের ওপর নির্ভর করে কি আমরা ডিসিশানে আসতে পারি যে তিনিই সত্যিকারের খুনী? এমনও কি ভাবা যেতে পারে না যে অন্য কাউকে বাঁচাবার জন্যে মৃত্যুর আগে নিজের কাঁধে সব দোষটা চাপিয়ে আসল খুনীকে আড়াল করে গেলেন? জগতে এমন ঘটনা ত ঘটেই। কিন্তু আমি বলব 'না'। অতনুবাবুর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীই একমাত্র সত্য।

অর্থাৎ তিনিই তাঁর ভাইঝিকে খুন করেছেন। আর তার প্রমাণও আমার কাছে আছে। এবং কেন খুন করেছেন তাও আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি।

—বাংলা ভাষায় কুলাঙ্গার বলে একটা শব্দ আছে। যার আভিধানিক অর্থ হল—যে ব্যক্তির অকীর্তির জন্য বংশ কলঙ্কিত হয়। কথাটা নিশ্চয়ই অতনুবাবুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সত্যিকার অর্থে তিনি কুলাঙ্গারই বটে।

—রামতনু লাহিড়ী, দেবতনু লাহিড়ী আর অতনু লাহিড়ী, এঁরা ছিলেন তিন ভাই। বয়সের পার্থক্য তিনজনের মধ্যে খুব বেশী নয়। দেবতনু আর অতনু ছিলেন যমজ ভাই। আর রামতনু ওঁদের দুজনের থেকে বছর পাঁচেকের বড়। তিন ভাইয়ের মধ্যে রামতনুই ছিলেন সজ্জন এবং ধার্মিক। কিন্তু বাকী দুজন কি স্বভাবে কি চরিত্রে এবং আচারে রামতনুর বিপরীত। অত্যন্ত ছোট বয়স থেকেই দুজনে অসৎ সঙ্গে পড়ে নেশার দাস হয়ে পড়েন। মদ এবং অন্যান্য নেশায় দুজনেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে নারীঘটিত দোষটা রপ্ত করেন দেবতনুবাবুই বেশী।

একজন আইন পড়তেন, একজন ডাক্তারী। লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিয়ে বাবা শুভ্রতনুর সিন্দুক ভেঙ্গে বা দোকানের ক্যাশ সাফ করে দুজনেই যথাসম্ভব টাকা ওড়াতে শুরু করেন। দু' ভাই-এর মতিগতি দেখে শুভ্রতনুবাবু প্রমাদ গুণলেন। তিনি ঠিক করলেন, মৃত্যুর আগেই উইল করে বেশীর ভাগ সম্পত্তিই বড় ছেলের নামে করে দেবেন। আর যৎসামান্য কিছু বাকী দুই ছেলের নামে থাকবে। করলেনও তাই।

দুই যমজ ভাইয়ের নামে নগদ কিছু করে টাকা আর কলকাতায় একখানা করে বাড়ি রেখে স্থাবর অস্থাবর আর পৈত্রিক ব্যবসা সবকিছু দিয়ে গেলেন রামতনু লাহিড়ীর নামে।

পাপড়ি হত্যার ক্ষীণ সূত্রপাত এখানেই। অর্থাৎ রামতনু এবং

রামতনুর দুই ছেলে মেয়ের ওপর পারিবারিক কারণে রাগ জমে থাকার কথা অতনু এবং দেবতনুর।

—কিন্তু অতনু হিংসা চরিতার্থের সুযোগ পান নি। বলতে গেলে সুযোগ দেন নি দেবতনুই। সে আর এক বিরাট রহস্য। বলতে পারেন পাপড়ি রহস্য ঘাঁটতে গিয়ে বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে বেরিয়ে এসেছে উনত্রিশ বছর আগের আর এক হত্যা রহস্য। হ্যাঁ, সেটাও একটা হত্যা। একটা ক্রাইম। কিন্তু সে রহস্য কোনদিনও সমাধান হয় নি। হোতও না, যদি না উনত্রিশ বছর পর আবার খুন হত এই বংশের আর একটি মেয়ে, যার নাম পাপড়ি।

—অবশ্য ঈর্ষা এবং হিংসাজাত কারণে যে পাপড়িকে হত্যা করা হয়েছে তা নয়। পাপড়ি হত্যার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। সে কথায় পরে আসছি। শুভ্রতনু লাহিড়ী মারা যাবার পর উইল দেখে দু' ভাই-এর চক্ষুস্থির। কিন্তু কোন উপায় নেই। তখন ত যা হবার হয়ে গেছে। কাঁচা টাকা পাবার পর দু' ভাই দু' হাতে টাকা ওড়াতে শুরু করলেন। ওড়াতে আরম্ভ করলে টাকা আর কতদিন থাকে। কিছুদিন পরই দুভাই নিজেদের ভাগের বাড়ি বিক্রি করার মনস্থ করলেন। জানতে পেরে রামতনু ন্যায্য দামের অতিরিক্ত টাকা দিয়েই সব কিছু কিনে নিলেন। কিন্তু ভায়েদের একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। শ্রীধর লেনের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় আজীবন থাকার অলিখিত নির্দেশ দিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে ছেলেকেও বলে রেখেছিলেন, অতনু আর তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে না দিতে।

এই সময় আমি একটা কথা না বলে পারলাম না—কিন্তু দেবতনুবাবুর কি হল?

—হুড়োহুড়ি করিস না। গুলিয়ে যাবে। সব বলছি। দেবতনুর এ্যাকসিডেন্টে মারা যাবার ব্যাপারটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ লোকের চোখে ঘটনাটা দাঁড় করানো হয়েছিল ঐ ভাবেই। আসলে বংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে দেবচরিত্রের রামতনুও জীবনে একটা মিথ্যের

আশ্রয় নিয়েছিলেন। তা হল দেবতনুর রহস্যময় অন্তর্ধানের মিথ্যা এবং সাজানো ব্যাখ্যা করা।

আপনারা কেউ চমকে উঠবেন না। কারণ এটা ঘটনা। ঘটনা মানেই সত্য। এবং সত্যের মত চমকপ্রদ আর কিছু নেই। আজ আপনারা যাঁকে অতনু লাহিড়ী বলে চেনেন, তিনি আদপেই অতনু লাহিড়ী নন। আজ থেকে উনত্রিশ বছর আগে অতনু লাহিড়ীকে খুন করা হয়েছিল।

নীলের বলা সত্ত্বেও আমরা সবাই চমকে উঠেছিলাম। এমন কি ডাক্তারও। বোধহয় তিনিও এসব কিছু জানতেন না। সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—তাহলে এই অতনু লাহিড়ী কে?

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে নীল বলল—ইনিই দেবতনু লাহিড়ী ওরফে সুরঞ্জন মিত্র।

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও আমরা কেউ এতটা চমকাতাম না। প্রায় কিছুক্ষণ সবাই নীরবে ওর বক্তব্যের মানে বুঝতে সময় নিলাম। সত্যেনদা নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—নীল, একটু বুঝিয়ে বল। ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছি না।

—হ্যাঁ, বলছি। টাকাপয়সা হাতে পেয়ে দু'ভাই ওড়াতে শুরু করলেন। আগেই বলেছি, দেবতনুর বিশেষ দুর্বলতা ছিল মেয়েদের ওপর। থিয়েটারের এক সুন্দরী অভিনেত্রীকে দেখে ওঁর মাথা ঘুরে যায়। সেই সময় তাকে পাবার জন্যে উনি মরীয়া হয়ে উঠলেন। অজু, বুঝতে পারছিস কে তিনি?

আমি বললাম—পারছি, অনিন্দিতাদেবী, তাই না?

নীল বলল—হ্যাঁ। সুরঞ্জন মিত্রের ছদ্মনামে তিনি অনিন্দিতা-দেবীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে গোপনে বিয়ে করেন। ইচ্ছে ছিল, অভিনেত্রী হিসেবে নাম করলে তার টাকা পয়সা আত্মসাৎ করা।

আমি বললাম—তাহলে ত—

নীল বলল—ইয়েস, পাপড়িকে হত্যা করার প্রধান কারণ এটাই। উদ্দালক মিত্র দেবতনু লাহিড়ীর ছেলে। যা উদ্দালক আজও জানে না। হয়ত কোনদিনও জানবে না।

ডাক্তার বললেন—তাই জন্যেই কি—

—হ্যাঁ, অনিন্দিতাদেবী দেবতনু ওরফে সুরঞ্জনের কোন খবর না রাখলেও দেবতনু সব খবর রাখতেন। আর এখানে একটা কথা বলে রাখি। জগতে সব থেকে বিচিত্র মানুষের মন। কখন যে সেই মনে কি বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোঝা সত্যিই দুষ্কর। নইলে দেবতনুর মত বিবেকহীন, চরিত্রহীন পাষণ্ডের মনে উদ্দালক আর পাপড়ির বিয়ে অসামাজিক, এ-চিন্তা আসত না। অথচ সেই লোক নিজেই সারাজীবন অসামাজিক কাজ করে গেছেন। সে কথা পরে—তবে তিনি যখন দেখলেন, তাঁরই ভাইঝি তাঁরই ছেলের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত, আদি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গোঁড়া সংস্কার তাঁর মত নৃশংস পুরুষেরও মনের ভিত নড়িয়ে দিল। তাঁরই ছেলে তাঁরই ভাইঝিকে বিয়ে করবে, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। প্রথম প্রথম পাপড়িকে অনেক বোঝালেন। যখন দেখলেন কিছুতেই কিছু হবার নয়, তখন বাধ্য হয়েই পাপড়িকে সরিয়ে দিলেন।

সিংহীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—তা অত কষ্ট করে অত রিস্ক নিয়ে মারতে গেল কেন? সোজাসুজি মালতির মত নাবিয়ে দিলেই ত হত?

সিংহীমশাই-এর কথা শুনে নীল একটু হাসল। তারপর বলল, এককালে দেবতনুবাবু ডাক্তারী পড়েছিলেন। সেটাই কাজে লাগিয়ে দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এটা আদপেই খুন নয়, এভাবে সমস্ত ঘটনাটা সাজাতে। ছোরাছুরি মেরে খুন করলে তার অনেক ঝামেলা। আর এইভাবে খুন করলে সহজে কারো চোখে পড়বে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, এই সামান্য ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা গেল না, আমার চোখে ধরা পড়ে গেল। অবশ্য

ডাক্তার বাসুর চোখেও ধরা পড়েছিল।

আমি বললাম—ভুলে যাব, তাই প্রশ্নটা এখনই করে রাখছি। বেছে বেছে বিয়ের দিনটাই বাছা হল কেন?

নীল বলল—প্রথমতঃ বিয়ের দিনে লোকে নানান কাজে ব্যস্ত থাকে। অন্য দিন কেউ দেবতনুকে পাপড়ির ঘরে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখে ফেললে তাঁকে অনেক কৈফিয়তের মুখে পড়তে হত। দ্বিতীয়তঃ, শেষ পর্যন্ত উনি চেষ্টা করেছিলেন যদি পাপড়ির মত পালটায়। কিন্তু তা পালটালো না। আর তৃতীয় কারণ, পাপড়িকে হত্যা করতে গেলে বিয়ের আগেই করা উচিত। তারও আবার দুটো কারণ—বিয়ের পর হত্যা করার অনেক অসুবিধা। আর যে কারণে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া, সেটার তখন আর দরকার থাকে না। চতুর্থতঃ, পাপড়ির বিয়ে হয়ে গেলে সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হয়ে যায়। দেবতনু ত আর কোনদিন উদ্দালককে নিজের ছেলে বলে দাবী জানাতে পারবেন না।

ডাক্তার বললেন—দেবতনুবাবু যদি ধরা না পড়তেন, তাহলে তাঁর লাভ কি হত? পাপড়ির মৃত্যুর পর সবই ত সুতনুর ভাগে পড়বে।

রহস্যময় কণ্ঠে নীল বলল—কে বলতে পারে যে, পাপড়ির মত একদিন সুতনুও খুন হতেন না? তবে তাতেও খুব লাভ হত না। কারণ, রামতনুবাবু দেবতনুকে ভালভাবেই চেনেন। পাপড়ির পর সুতনুর কিছু হলে উনি সঙ্গে সঙ্গে উইল চেঞ্জ করতেন।

আমি বললাম—তুই কিন্তু দেবতনু আর অতনুর আসল রহস্যটা পাশে সরিয়ে রেখে গেছিস।

—বলতে আর দিচ্ছিস কোথায়? ক্রমাগত সাইড প্রশ্ন তুললে ঐ রকমই হবে।

—বেশ, আর এখন প্রশ্ন করব না। ওই রহস্যটা কি তাই বল।

—এক ভাই, মানে দেবতনু যখন অনিন্দিতাকে ফেলে রেখে কাট-বার মতলব খুঁজছেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন ভাই অতনুর সঙ্গে

দেখা। অতনু তখন একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন। মানে, সিরিয়াসলিই করছেন। যদিও অতনুর চরিত্রে অনেক দোষ ছিল তবুও এই প্রেমের ব্যাপারে বোধ হয় উনি খুব সিনসিয়ার ছিলেন। ভাই-এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে খুব সরল মনেই আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে। মেয়েটি ছিলেন সত্যিকারের সুন্দরী। চির-কালের নারীলোভী পুরুষটি ভাইয়ের প্রেমিকাকে দেখে চনমন করে উঠলেন। ঈর্ষায় জ্বলে গেলেন, যখন শুনলেন মেয়েটি এক বিরাট ধনী বাপের একমাত্র মেয়ে। তার অর্থ রাজ্য আর রাজকন্যা। তখনই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, এই মেয়েটির সঙ্গে কিছুতেই অতনুর বিয়ে হতে পারে না। অতনুর ছিল একটাই দোষ। নেশা। মদের। কিন্তু দেবতনুর ছিল মদ, আর মেয়েছেলে। আর চরিত্রে ছিল লোভ, হিংসা এবং পরস্ব অপহরণের ক্ষুধা।

মনে মনে তিনি ভাবতে শুরু করলেন, যেমন করেই হোক, অতনুর প্রেমিকাকে পেতে হবেই। কারণ ওদিকে অনিন্দিতা তখন পুরনো হয়ে গেছে। তার ওপর তার গর্ভে এসেছে সন্তান। অবশ্য সে সমস্যার সমাধান তিনি করেই ফেলেছিলেন—রতন হালদারের কাছে দশ হাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন অনিন্দিতাকে।

জীবনটা তখন তাঁর ফাঁকা। কোন মহিলা নেই। সব লোভ গিয়ে পড়ল অতনুর প্রেমিকার ওপর। দুজনের চেহারায় ছিল আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য। দেবতনু আর অতনুকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে অত্যন্ত চেনা লোকেরও সহসা বুঝতে অসুবিধা হত, কে কোন্ জন। স্বয়ং রামতনুও গণ্ডগোল করে ফেলতেন। সুযোগটা নিলেন দেবতনু। ভাইয়ের ছদ্মবেশে মাঝে মাঝেই অতনুর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতেন।

ব্যাপারটা আন্দাজ করেই হোক, অথবা অন্য কারণেই হোক, অতনু মনস্থির করলেন, বিয়েটা খুব শীঘ্রই সেরে ফেলবেন। দাদা রামতনুকে এসে সব বললেন। রাজী হয়ে গেলেন রামতনু।

তারপর এক শুভ লগ্নে আর একটি মেয়ে দেখে দেবতনু আর অতনুর বিয়ে দিলেন। দেবতনুর ইচ্ছে ছিল না। কারণ তাঁর লোভ অতনুর ভাবী স্ত্রীর ওপর। তবু অর্থের লোভে রামতনুর দেখে দেওয়া এক ধনী পিতার সুন্দরী মেয়েকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেই বসলেন।

কয়েকদিন পর নতুন বৌয়ের নেশা কেটে যেতেই তাঁর আগের লোভ ফিরে এল। চোখের সামনে তাঁর বৌ-এর থেকেও অনেক সুন্দরী অতনুর বৌ ঘুরে বেড়ায়। অথচ ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারেন না। মুখে কিছু প্রকাশ না করে মনে মনে এক বীভৎস প্ল্যান করলেন।

মনে হয় দেবতনুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই অতনু তাড়াতাড়ি বিয়ে করেছিলেন। ভেবেছিলেন বিয়ের পর দেবতনু নিশ্চয়ই আর তার বৌ-এর উপর নজর দেবে না। যতই হোক, ভাই-এর বৌ ত। কিন্তু দেবতনু কুটিল আর শঠ। অতনুর মানসিক ধারণা অনুযায়ী তিনি অত্যন্ত ভালমানুষের ছল গ্রহণ করলেন। ভুলেও তখন ফিরে তাকাতেন না অতনুর স্ত্রীর দিকে।

কিছুদিন পর বিশ্বাসটা ফিরে এলে ভাইকে বাইরে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিলেন। একটা জিনিস প্রায়ই দেখা গেছে, যারা অত্যধিক মদ্যপান করে তাদের মনটাও খুব খোলামেলা হয়। অতনুর ছিল তাই। মদ আর রেস নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কূটবুদ্ধিগুলো তাঁর মাথায় খেলত কম। ভাই-এর কথায় সরল বিশ্বাসে দুই ভাই আর তাঁদের দুই বউ বেড়াতে গেলেন উটি।

তারপর যখন ফিরে এলেন, দেখা গেল চারজনের বদলে ফিরেছেন তিনজন। অতনু, অতনুর স্ত্রী মালবিকা আর দেবতনুর পাগল বৌ নন্দিতা।

—বড় গোলমেলে, বড় গোলমেলে বলে চিৎকার করে উঠলেন সিম্পল লায়ন, এটা কি রকম হোল ? এটা ত ঠিক বুঝতে পারলুম না।

নীল হেসে বলল—আপনি কেন, প্রথমে অনেকেই বুঝতে পারেন নি। রামতনুবাবুও না, মালবিকাদেবীও না।

অস্বস্তি আর অধৈর্যে আমি বলে উঠলাম—কি হচ্ছে নীল? কেস ক্লিয়ার কর। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

—শীতের এক বিকেলে দুই ভাই আর তাদের দুই বৌ উটির পাহাড়ী পথ ধরে অনেক দূর বেড়াতে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই পুরুষরা একটু দ্রুত হাঁটেন। ফলে দুই বৌ একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। আগেই বলেছি, অতনু প্রচণ্ড মদ্যপান করতেন। সর্বদাই ওঁর পকেটে থাকত রুপোর তৈরী মদের বট্‌ল্‌। সেদিনও তিনি মদ খেতে খেতে ভাই-এর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় ওঁরা দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তার ওপর সন্ধ্যে নেমে আসার দরুন কুয়াশা আর অন্ধকারে দুই বউ তাঁদের স্বামীদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড আর্তনাদে পাহাড়ের নির্জন আকাশ বাতাস যেন কেঁপে উঠল। মালবিকা আর নন্দিতা ভয় পেয়ে সামনের পথ ধরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখেন, এক ভাই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। আর একজন নেই।

ওঁদের দু'জনকে ওখানে পৌঁছতে দেখে যে ভাই মাথায় হাত চেপে বসে ছিলেন, তিনি মালবিকার কাছে ছুটে এসে বললেন—সর্বনাশ হয়ে গেছে মালবি?—দেবু মদের ঝোঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়েছে। কি হবে মালবি?—বলেই হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিলেন।

—সব শুনে নন্দিতা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরলে দেখা যায়, তাঁর মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

সত্যেনদা বললেন—তার মানে—

কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল—মানেটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে নি। রামতনুবাবুর কাছেও নয়। ধরা পড়ল মালবিকাদেবীর কাছে। কিন্তু

ধরা যখন পড়ল, তখন মালবিকার আর কিছু করার ছিল না।

ডাক্তার বাসু বললেন—অর্থাৎ সে রাত্রে অতনুই পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল?

নীল বলল—না ডাক্তার। একটু ঘুরিয়ে বলি, দেবতনুই অতনুকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। মেয়েরা পৌঁছতেই দেবতনু নিজেকে অতনু বলে চালিয়ে দেন।

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করি—তুই এত সব জানলি কেমন করে?

—মালবিকাদেবীর কাছ থেকে। মালবিকাদেবীর যে স্বভাবটা তুই দেখেছিস, সেটা তাঁর মুখোশ। আসলে ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ভাল। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর আসল নারীসত্তাটা বেরিয়ে এসেছিল। কাঁদতে কাঁদতে সবই তিনি আমাকে বলেছিলেন।

—কিন্তু দেবতনুবাবু যে অতনুবাবু নন, এটা উনি স্ত্রী হয়েও বুঝতে পারলেন না?

—কেন পারবেন না। স্ত্রী কখনও তাঁর স্বামীকে না চিনে থাকতে পারেন? যতই চেহারার মিল থাক, স্ত্রীর চোখে নকল স্বামী ধরা পড়বেই। কিন্তু ধরা যখন পড়ল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, সেই সময় সারা বাড়িতে হুলুস্থূল কাণ্ড। এক ভাই মারা গেছেন। আর এক বৌ পাগল হয়ে গেছেন। তার ওপর থানা পুলিস ডাক্তার। চারিদিকে নানান ঝামেলায় কি রামতনু, কি মালবিকা, কেউই তখন দেবতনুর আসল-নকল নিয়ে চিন্তা করার অবসর পান নি। তারপর ঘটনার রেশ যখন একটু কমে এল, সেই সময় একদিন মালবিকার কেমন যেন দেবতনুকে হঠাৎই সন্দেহ হল। স্বামীদের কিছু বিশেষ বিশেষ স্বভাবের সঙ্গে স্ত্রীরা অত্যন্ত পরিচিত হন। অথচ বর্তমান অতনুর সঙ্গে পুরনো অতনুর সেই স্বভাবগুলোর মিল তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন দেবতনু অনেক রাত্রে মদ্যপান করে এসে মালবিকার সঙ্গে দৈহিক মিলনের চেষ্টা করেন। সমস্ত গণ্ডগোলটা বাধে এখানেই। দেবতনু ও অতনু উভয়েই মদ্যপান

করতেন। কিন্তু দেবতনু জানতেন না অতনুর চরিত্রের আর একটা বিরাট দিক ছিল। স্ত্রীকে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন। কোনদিনও তিনি মদ্যপান করে তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত দিতেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাদেবী তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। এক ধাক্কায় দেবতনুর শিথিল দেহটা ফেলে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর সেই রাত্রেই এক এক করে তাঁর সব কথা মনে পড়েছিল।

দুর্ঘটনার দিন অতনু প্রথমে কালো প্যাণ্ট আর সাদা ট্যুইড কোট পরেছিলেন। আর দেবতনু পরেছিলেন ব্ল্যাক স্যুট। কিন্তু দেবতনুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত অতনুকে সাদা কোট ছেড়ে কালো কোট পরতে হয়েছিল। হাসতে হাসতে সেদিন বেরুবার সময় দেবতনু অতনুকে বলেছিলেন—নয় আজ দুই ভাই একই রকম ড্রেস করলাম। তোর কি ভয় হচ্ছে, আমাদের বৌরা আমাদের চিনতে পারবে না?

এ ছাড়া আরো একটা মারাত্মক জিনিস প্রমাণ হিসেবে সংগ্রহ করতে দেবতনু ভুলে গিয়েছিলেন। সেটাও ঘটনার আকস্মিকতায় মালবিকাদেবীর তখন মনে পড়ে নি। কিন্তু পরে খতিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন—অতনুর ছদ্মবেশী দেবতনুর মুখে সেদিন মদের কোন গন্ধ পান নি, আর অতনুর কাছে দেখতে পান নি রুপোর মদের ডিবেটা। দেবতনু ভুল করে ভাইকে ঠেলে ফেলে দেবার আগে মদের ডিবেটা সংগ্রহ করে নেন নি। অবশ্য পরে সন্দেহভঞ্জনের জন্যে দেবতনু একই রকম একটা মদের ডিবে তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আসল নকলের পার্থক্য তখন ধরা পড়ে মালবিকাদেবীর কাছে।

—তা মালবিকাদেবী যখন সব জানতেই পারলেন, তখন তিনি ফাঁস করে দিলেন না কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—কি হবে ফাঁস করে? এক ভাইকে খুন করার অপরাধে আর এক ভাইয়ের ফাঁসি? এবং খুন করার কারণ কি? ভাইয়ের বৌকে আত্মসাৎ করা। বনেদী বংশের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

—তাই বলে এত বড় মিথ্যেটাকে উনি মেনে নিলেন ?

—উপায় কি, গোঁড়া বাঙালি পরিবারের বৌ। নিজের কাছে নিজে সাচ্চা থাকলেও তুনিয়ার মানুষ ত চুপ করে থাকবে না। নানান লোকে মিথ্যে কলঙ্ক রটাবে। মালবিকাদেবীর তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকত না।

—এ সব কিছু রামতনুবাবু জানতেন ? আবারও আমি প্রশ্ন করলাম।

—মালবিকাদেবীই সব জানিয়েছিলেন। অনেক পরে। তখন ত আর কিছু করার নেই। সেদিন থেকেই রামতনুবাবু আর দেবতনুর মুখ দেখতেন না। আর মালবিকার ওপর নির্দেশ দিয়েছিলেন—এ কলঙ্কের কথা যেন বাইরের লোক জানতে না পারে। মালবিকা কথা রেখে-ছিলেন। একমাত্র নীল ব্যানার্জী ছাড়া বাইরের কোন লোক আসল দেবতনুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ সবের কিছুই জানতে পারে নি। লোকদেখানো স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করা ছাড়া কোন ভাবেই দেবতনুকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। এমন কি লক্ষ্য করলেই তুই দেখতে পেতিস, শাঁখা-সিঁদুর কোন কিছুই উনি পরতেন না। খুব সাধারণ আটপৌরে শাড়ি পরেই কাটাতেন। অজু, একটা জিনিস বোধ হয় এখনও মনে করতে পারবি, যে ঘরটায় আমরা সেদিন গিয়েছিলাম, মেয়েদের কোন ব্যবহৃত জিনিস সেখানে ছিল না। সেদিন আশ্চর্য হলেও এখন কিছু বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওঁরা এক ঘরে থাকতেন না। তু'জনের ঘর আলাদা। সামনে এলে দেবতনুকে কুকুরের মত লাথি ঝাঁটা মারতেও দ্বিধা করতেন না।

সত্যেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—নন্দিতাদেবীর কি হল ?

এক ট্র্যাজেডির নায়িকা। আজও তিনি উন্মাদ হয়ে ও বাড়িতে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। তবে এখনও তাঁকে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা করা যায়, হয়ত ভালো হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রামতনু লাহিড়ী তা চান না। যে আঘাত নিয়ে তাঁর ভাই-এর স্ত্রী সেদিন

পাগল হয়েছিলেন, আরো এক কলঙ্কময় নতুন আঘাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হোন, এটা তাঁর কাম্য নয়। তার চেয়ে এই বরং ভাল। অন্ধকারের জগতেই তাঁর জীবন শেষ হোক। কিন্তু আলোর জগতে ফিরিয়ে এনে নতুন করে আঘাত দিতে তিনি আর চান নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আর সে রাত্রে ওনারই কান্নার আওয়াজ আমরা পেয়েছিলাম?

ঘাড় নেড়ে নীল জবাব দিল—হ্যাঁ। আজও উনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। আমার কথা শেষ। এবার আপনাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে করতে পারেন।

আমি বললাম—তাহলে আমিই প্রশ্ন করি। কেন না, আগা-গোড়া আমিই ত তোর সঙ্গে ছিলাম।

—বেশ, প্রশ্ন কর।

—দেবতনুবাবু মালতিকে খুন করলেন কেন?

—ভয়ে। পাছে ও সেদিন রাত্রে সব কথা বলে দেয়।

—কিন্তু তুই ত সেদিন সকালে বলে এলি, পরের দিন সকালে গিয়ে মালতির সঙ্গে দেখা করবি।

—সেটা আমার একটা চাল। আসলে আমি খুনীকে জানাতে চেয়েছিলাম, মালতি যা জানে, সেটা আমাকে গোপনে বলতে চায়। আর রাতের অন্ধকারই সব থেকে গোপনীয় পরিবেশ। দেবতনু যখন জানতে পারলেন, সেদিন রাত একটায় মালতি বাগানের পিছনে যাবে, তখন তিনি আমাকে অন্যভাবে কল্পিত বিপদের কথা পেড়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইলেন না। আমিও ভান করলাম, অত রাতে দেখা করা সত্যিই আমার পক্ষে অনুচিত। তাই পরের দিন আসব, এই কথাটা ওঁকেই বলে দিতে বললাম। আমি জানি, খুনী এ সুযোগ কখনোই ছাড়বে না। আমাকে আসতে বারণ করল বটে, কিন্তু মালতিকে কিছুই বলল না। ঠিকই করে নিল মালতিকে সেই রাত্রে খুন করবে।

আমার দুর্ভাগ্য, মালতিকে বাঁচাতে পারলাম না। তবে এ এক-দিকে ভালই হল। বেঁচে থাকলে ওকে পুলিসের হাতেই যেতে হত।

—কেন? ও কি সত্যিই এই খুনের সঙ্গে ইনভলভড্ ছিল?

—না। ঠিক ইনভলভড্ না। তবে খুনীকে সাহায্য করার অপরাধে শাস্তি পেতো।

—ও কিভাবে সাহায্য করেছিল?

—দেবতনুর পাপড়ির ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিল। রামতনুবাবুর কড়া নিষেধ ছিল, উনি কখনোই কোন কারণে তিনতলায় আসবেন না। তাই মালতিকে দেবতনু হাত করেছিলেন অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে। মালতির টাকার নেশা চিরদিনের। কোনদিনই ও বিশ-পঁচিশের বেশী টাকা একসঙ্গে হাতে পায় নি। বিয়ে করেও না। দেবতনু সামান্য একটা কাজের জন্যে পাঁচ হাজার টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন। টাকার অঙ্ক শুনেই ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারে নি, পাঁচ হাজার টাকা দেবার ক্ষমতা দেবতনুর নেই।

—কিন্তু সাহায্যটা কি?

—বলছি। প্রথম যেদিন পাপড়ির ঘরে গিয়েছিলাম সেদিন অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। অ্যাকোয়া-রিয়ামের গাছগুলো ঘাঁটা ছিল। কিছু জলে ভাসছিল। কেন? এই কথাটা ভাবতে গিয়ে আমার হঠাৎই মনে হল ওখানে কি কেউ কোন কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে? এমন কোন জিনিস যা অত্যন্ত দামী, অথচ লুকিয়ে রাখার একটা প্রকৃষ্ট জায়গা। তাই যদি হবে তাহলে কি সে মূল্যবান বস্তু? পাপড়ির ঘরে একা বসে একদিন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল চাবির কথাটা। তবে কি চাবিটা ওখানেই। হ্যাঁ, চাবিটা ওখানেই রাখা হয়েছিল। অবশ্য খুনের পরদিন সে চাবি চলে যায় রামতনুবাবুর কাছে। সুদাম বাগানে কুড়িয়ে পায়। এখন সে চাবি পুলিসের জিম্মায়। চাবির ফুটোয়

কিছু বালি পাওয়া গিয়েছিল, প্রমাণ হিসেবে। আসলে মালতি এক সময় চাবির গোছাটা সরিয়ে ফেলে অ্যাকোয়ারিয়ামের বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বিয়ের দিন পাপড়ি চাবিটা ভালো করে খুঁজে দেখার সময় পায় নি। বাবার কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি এনে তাই দিয়ে সেদিনের মত কাজ চালিয়েছিল। মালতির চাবি সরানোর একটা উদ্দেশ্য, দেবতনুকে বাথরুমের দরজা খুলে দেবার জন্য। কারণ সোজা রাস্তায় পাপড়ির ঘরে দেবতনুর যাবার হুকুম ছিল না। অথচ ঘরে ঢুকতে হবে। এবং পাপড়িকে খুন করতে হবে। তাই মালতিকে হাত না করে কোন উপায় ছিল না। মালতি সেদিন ঠিক সন্ধ্যের আগেই অ্যাকোয়ারিয়ামে বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখা চাবি বার করে বাথরুমের দরজাটা খুলে চাবির গোছা বাগানে ফেলে দেয়। এবং ইশারায় ডুমুর গাছের তলায় অপেক্ষমাণ দেবতনুকে কাজ হাসিল হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। তবে সে জানত না দেবতনু পাপড়িকে খুন করতে চাইছে। সে ভেবেছিল, হয়ত দেবতনু কিছু টাকাকড়ি বা গয়নাগাটি সরাবে পাপড়ির দেরাজ ভেঙ্গে।

—কিন্তু দেবতনুবাবু এইভাবে খুন করলেন কেন? এত পরিশ্রম ও রিস্ক নিয়ে। ভেনে বাব্‌ল ঠিকমত না গেলে পাপড়ির মৃত্যু নাও হতে পারত।

—ওটা নিজের ওপর ওভার কনফিডেন্স বলা যায়। দেবতনু নিজে ডাক্তারী পড়েছিলেন। তিনি জানতেন, ঐভাবে একজনের মৃত্যু ঘটানো যায়। এবং খুনটা হবে খুব রেয়ার। সহসা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। দ্বিতীয়তঃ, খুনের অস্ত্র সর্বদাই তার কাছে থাকত। কারণ তিনি ছিলেন মরফিন অ্যাডিকটেড। নিজেই নিজের ইনজেকশান নিতেন। ইনজেকশানে ওনার হাত পাকা। হাতের কাছে যার খুনের অস্ত্র রেডিমেড থাকে, সে স্বভাবতঃই সেই অস্ত্র আগে ব্যবহার করতে চাইবে।

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বলে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সিগারেটের প্যাকেটের রহস্যটা ক্লীয়ার হল না। ওটার ব্যাপার কী?

—ওটা ডাক্তারকে ঝোলানোর তাল। দেবতনুবাবু ধারণা করেছিলেন, এই ধরনের মার্ডারের কথা সাধারণতঃ কেউ ভাববে না। কিন্তু অপরাধীর মন অনেক কিছু সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে। যদি কেউ খুনটা ধরেও ফেলে, তাহলে সব থেকে সুবিধা হবে দোষটা অন্য কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে কার ঘাড়ে চাপানো যায়? দেবতনুবাবু জানতেন, খুনের প্রক্রিয়া বিচার করার টেন্‌ডেন্সি পুলিসের আছে। খুনের ধরন দেখে সহজেই অনুমান করবে, এটা কোন ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডারের কাজ হতে পারে। এখন এই পরিবেশে কোন্ ডাক্তার সব থেকে ক্লোজ-এ আছে? ডাঃ অরিন্দম বাসু। তাহলে তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপানোর সহজ রাস্তাটা বেছে নিলেন দেবতনুবাবু। নিজে চারমিনার খেতেন। সেদিন কিনলেন রয়্যাল সাইজের ফিল্টার উইল্‌স্। যেটা ডাক্তারের নিজস্ব ব্র্যাণ্ড। ছুটো সিগারেট গোটাটাই খেলেন। তৃতীয় সিগারেটটা অর্ধেক খেয়ে ফেলে দিলেন। যাতে ব্র্যাণ্ডের নাম শেষ পর্যন্ত পুড়ে না যায়। প্রমাণ আরো নিশ্চিত করার জন্যে ডাক্তারের বিশেষ হ্যাবিটের নমুনাটাও সঙ্গে রেখে দিলেন। কাটা রাংতা সমেত প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে এলেন, যাতে পুলিসের নজরে এলে, ডাক্তারকেই প্রথম সন্দেহ করে। আর এর সঙ্গে একটা পুরনো রাগের ব্যাপারও জড়িয়ে ছিল। ডাক্তার ওনার মরফিন পারমিটের যোগদানদার হন নি বলে।

এ ছাড়াও ডাক্তারের দিকে পুরোপুরি সন্দেহটা চালান করার জন্যে আমার কাছে বানিয়ে পাপড়িকে নিয়ে একটা কল্পিত কাহিনী বলে গেলেন। যাতে করে আমি সন্দেহ করতে পারি, প্রেমের ঈর্ষার জন্যেই ডাক্তার এ খুন করেছিল। তাই ত ডাক্তার বাসু? আমি ঠিক বলছি ত?

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন—আমি আর কি বলব বলুন। আপনি

না হয়ে অন্য কেউ হলে হয়ত এতদিনে আমি শ্রীঘরে।

—নীল, তোকে আর একটা প্রশ্ন করব, আচ্ছা, মালতি তোর কাছে সারেণ্ডার করল কেন? ও কি তোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল?

—দূর, প্রেম-ট্রেম সব বাজে কথা। এ ধরনের মেয়েরা সাধারণত প্রেম-ট্রেমের গভীরতা বোঝে না। ওর টাকাটাই সব থেকে বড়। খানিকটা ভয়ে এবং আশাহত হওয়ার জ্বালায় আমার কাছে কনফেস করেছিল। ওর ভয় হয়েছিল, হয়ত পুলিস একদিন সব টের পাবে। আর যখন দেখল, দেবতনুর কাছ থেকে পয়সাকড়ি পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন বাধ্য হয়েই আমার কাছে সারেণ্ডার করল। অবশ্য বিনিময়ে আমাকে শ'তিনেক টাকা বলতে পারিস মালতিকে ঘুষ দিতে হয়েছিল। টাকাপয়সার লোভ না দেখালে মালতিকে কাবু করা যেত না।

—খিড়কির দরজা কে খুলে দিয়েছিল?

—সুদাম নয়। ও বোকা কালা এবং চোখে কম দেখার ভান করে থাকত, কারণ রামতনুবাবুর সেই রকমই নির্দেশ ছিল। অতনু দেবতনুর ঘটনাটা আন্দাজ করেছিল লোকটা। তবে এসব ব্যাপারে ও কিছুই জানত না। হয় সেদিন খিড়কির দরজা দেওয়া হয় নি, নয়ত মালতিই এক সময় খুলে দিয়েছিল।

হঠাৎ সত্যেনদা একটা প্রশ্ন করলেন—তুমি কি করে ডেফিনিট হলে, দেবতনুবাবু আর সুরঞ্জনবাবু একই লোক?

ড্রয়ার থেকে দুটো ছবি এনে সবাইকে দেখালো নীল। তারপর বলল—এই দুটো ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই পুরনো লালচে ছবিটা পেয়েছি অনিন্দিতাদেবীর কাছ থেকে। মাত্র একটা কপিই ছিল ওনার কাছে। আর এটা ত সেদিনের বাগানে তোলা নিকন এফ্ টু ক্যামেরায় ধরা মার্ডার করা অবস্থায় তোলা। অবশ্য মার্ডার করা ছবিটা থেকে বুঝতে অসুবিধা হলেও, চেহারা যতই খারাপ হয়ে যাক, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই সবাই বুঝতে পারবেন অতীতের সুরঞ্জন মিত্র

আর বর্তমানের দেবতনু লাহিড়ী একই লোক। অনিন্দিতাদেবীও আইডেনটিফাই করেছেন। ব্যাস, নিশ্চয় আর কারো কিছু জানবার নেই।

আমি বললাম—আছে।

—এখনও আছে? কি বল্?

—মালতি চাবিটা বাগানে ফেলে দিয়েছিল কি দেবতনুর জন্যেই।

—হ্যাঁ। কিন্তু চাবি তো দেবতনুর উদ্দেশ্য না। ওইভাবে মালতিকে বোঝানো হয়েছিল, যে চাবিটা পেলে উনি পাপড়ির আলমারি থেকে কিছু টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করবেন। আসলে দেবতনু নিজের উদ্দেশ্য মিটিয়ে নেবার পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিলেন। তারপর একসময় সবার অলক্ষ্যে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান।

—তবে যে মালতি বলল, ছাদ থেকে সে স্নুতনুকে নামতে দেখেছিল?

—দেখে থাকতে পারে। সেটা ত খুব অস্বাভাবিক কিছু না। আর কি প্রশ্ন?

—তুই ত জানতেই পেরেছিলি, কে খুনী, তাহলে সেদিন সবার কাছে, আই মীন, স্নুতনু আর ডাক্তার বাসুর কাছে একই প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলি কেন?

—খুব ভালো প্রশ্ন। দেবতনুবাবুর বিরুদ্ধে সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ওঁকে হাতেনাতে ধরা বা কোন রকমে ওঁকে কনফেস করানো ছাড়া অন্য কোনভাবেই প্রমাণ করানো যেত না যে পাপড়িকে উনি হত্যা করেছেন। নট ইভ্‌ন্ দা ফিঙ্গার প্রিন্ট। তা ছাড়াও মোটিভের দিক থেকে আরো দুজন অর্থাৎ স্নুতনু বা ডাঃ বাসু ফেলনা নন। আমি ত আর ভগবান নই। আমার মনেও কিছু সন্দেহ ছিল। কোথাও ভুল করছি না ত? তাই টোপটা তিন জায়গায় ফেলেছিলাম। সত্যিকারের যে খুনী, একমাত্র সে-ই সেদিন রাত্রে আসবে, তার শেষ শত্রুকে খতম

করতে। অন্য দুজন আসবেই না। আর ঘটনা ত তাই ঘটল। আর এক রাউণ্ড চা হবে নাকি?

সমস্বরে সবাই বললাম--হয়ে যাক।

নীল বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম—নীল, তোর আর একটা প্রেডিকশান কিন্তু মিলে গেছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল—তোর ভুবনবাবু কেন একটা মোরগ কিনেছেন? এই ত? সে তো আমি আগেই বলে দিয়েছি।

নীল আর দাঁড়াল না। গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

—